জুন ২০২০ ▪ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

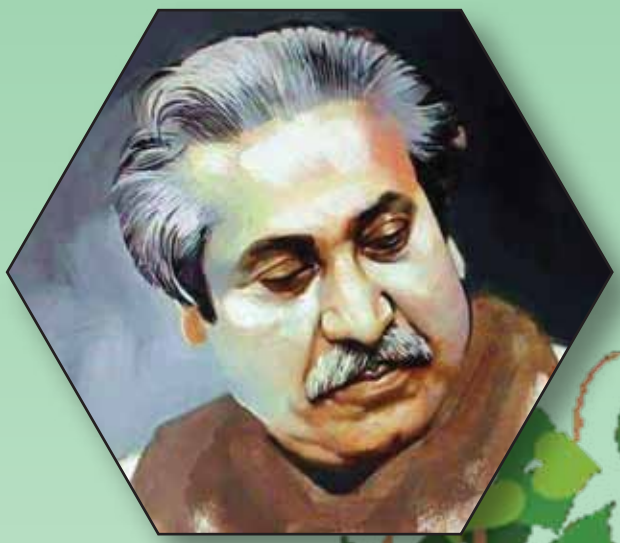

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা
বাঙালির মুক্তির সনদ
জাতির পিতা ও জাতীয় কবি
পরিবেশ দিবস ও জলবায়ু কূটনীতি
অদম্য করোনাযোদ্ধা
অন্তিম যাত্রাপথের বন্ধু

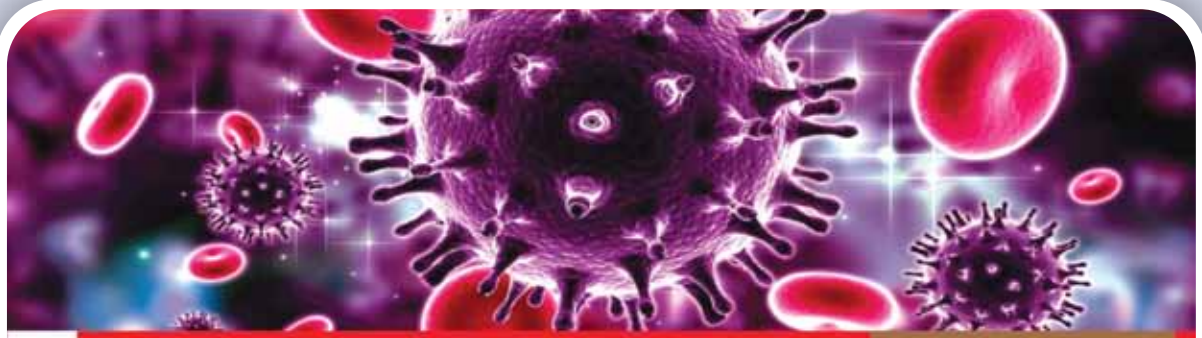

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুন ২০২০ ❑ জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ় ১৪২৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই জুন ২০২০ উপলক্ষে গণভবন থেকে গণমাধ্যমে প্রচারিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ঘটে এক ঐতিহাসিক বিপ্লবী ঘটনা। ছয় দফা আন্দোলনে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁদের স্মরণ করার জন্যই প্রতিবছর ৭ই জুন ছয় দফা দিবস পালিত হয়। ছয় দফা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১১ দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ নিয়ে এবারের সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। 'পরিবেশ সুরক্ষা' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগের ১টি। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ। গ্রীষ্মের এই মধুমাসে পাওয়া যাচ্ছে নানা দেশীয় ফল। করোনা মহামারিতে পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয় চলছে। চলছে রেড এলার্ট 'লকডাউন'। সেই সঙ্গে হোম কোয়ারেন্টাইন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিপর্যয় মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। করোনা নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

বাবা দিবসসহ আরো কয়েকটি দিবস নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ। এবারের ঈদ গতানুগতিক ঈদের মতো পালিত হয়নি। সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ছিল বিধিনিষেধ। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধসহ নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে জুন সংখ্যা।

আশা করি, এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
মহাঃ শামসুজ্জামান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪
বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা: বাঙালির মুক্তির সনদ ৭
নাজমা ইসলাম
জাতির পিতা ও জাতীয় কবি ৯
শাফিকুর রাহী
পরিবেশ দিবস ও জলবায়ু কূটনীতি ১০
ফারিহা রেজা
লাহোর প্রস্তাব থেকে ছয় দফা
বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উন্মেষ ১২
কে সি বি তপু
ঘরে বসে মুজিববর্ষ পালন করতে পারি যেভাবে ১৪
আজহারুল আজাদ জুয়েল
আলোকিত পথিকৃৎ আনিসুজ্জামান ১৫
শ্যামল দত্ত
জীবন গড়ার কারিগর বাবা ১৭
শিহাব শুভ
আধুনিক কবিতাচর্চায় নারী ১৮
ড. শিল্পী ভদ্র
বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে সুফিয়া কামাল ২১
জাহানারা বেগম
অদম্য করোনাযোদ্ধা: অন্তিম যাত্রাপথের বন্ধু ২৫
এস আর সবিতা
শুদ্ধাচারের নীতি হোক জীবনের ভিত্তি ২৮
জিনাত আরা আহমেদ
রক্ষাকবচ সুন্দরবন ২৯
ফাতেমা আক্তার হ্যাপি
বর্ষার প্রকৃতি ও রূপ ৩১
লতা খান
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাপন ৩৩
সোহেল আহমেদ
বজ্রপাত: কারণ ও প্রতিকার ৩৬
মিঞ্জু মান্নান
মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে বাংলাদেশ ৩৮
জেসিকা হোসেন
রক্তদানের গুরুত্ব ৩৯
মো. ইসফাক কাদের

হাইলাইটস

পথিকৃৎ চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ১২২ বছর ৩৯
আপন চৌধুরী

করোনাকালে ডেঙ্গু সচেতনতা ৪১
শফিকুল ইসলাম

গল্প

হলো না বাবার কবর জিয়ারত ৪৩
সালাম হাসেমী

কবিতাগুচ্ছ ২৩, ২৪, ৩২
মিয়াজান কবীর, রকিবুল ইসলাম, শাহনাজ খান আসাদুজ্জামান, সাদিয়া সুলতানা, অদ্বৈত মারুত সুষমা ফাল্গুনী, রুস্তম আলী, ইজামুল হক মালিহা হোসেন, মো. সাঈদ হোসেন, ইফফাত রেজা অপূর্ব বিক্রমাদিত্য, মো. নূরে আলম, রানা হোসেন

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৫
প্রধানমন্ত্রী ৪৬
তথ্যমন্ত্রী ৪৭
জাতীয় ঘটনা ৪৮
আন্তর্জাতিক ৪৯
উন্নয়ন ৪৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫০
শিল্প-বাণিজ্য ৫০
শিক্ষা ৫১
বিনিয়োগ ৫১
নারী ৫২
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৩
কৃষি ৫৩
বিদ্যুৎ ৫৪
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৫
নিরাপদ সড়ক ৫৬
কর্মসংস্থান ৫৬
স্বাস্থ্যকথা ৫৭
যোগাযোগ ৫৮
চলচ্চিত্র ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
মাদক প্রতিরোধ ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
ক্রীড়া ৬২
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ৬৪

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ

লাহোরে পূর্ব পাকিস্তানের জননন্দিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করেন। ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান নিজের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা কর্মসূচি' শীর্ষক পুস্তিকা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রচার করেন। এই ছয় দফাকে বাংলার জনগণের বাঁচার গণদাবিতে রূপান্তরিত করেন বঙ্গবন্ধু। ছয় দফার জনপ্রিয়তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে ভাবিয়ে তোলে। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। ঐতিহাসিক ছয় দফা বিষয়ে 'বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা: বাঙালির মুক্তির সনদ' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং 'লাহোর প্রস্তাব থেকে ছয় দফা: বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উন্মেষ' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা–৭ ও ১২

জাতির পিতা ও জাতীয় কবি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবল প্রজ্ঞা, পরম মানবিকতা, মহত্তম উদারতার ফলে বাংলাদেশের জাতীয় কবির সর্বোচ্চ সম্মানিত আসন অলংকৃত করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিদ্রোহী ও মানবতার কবি আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দেশপ্রেমী ও রাজনীতির কবি। সাম্য ও সম্প্রীতির মহাবন্ধনে সমগ্র মানব জাতিকে এক কাতারে দাঁড় করানোর অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে তাঁদের সকল কর্মে ও উচ্চারণে। 'জাতির পিতা ও জাতীয় কবি' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৯

পরিবেশ দিবস ও জলবায়ু কূটনীতি

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ বাঁচানোর সংকল্পে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য এটিই সঠিক সময় বলে মনে করছে জাতিসংঘ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের এ ধরনের যুগান্তকারী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীকে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করে। 'পরিবেশ দিবস ও জলবায়ু কূটনীতি' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১০

অদম্য করোনাযোদ্ধা অন্তিম যাত্রাপথের বন্ধু

বাংলাদেশের করোনাযোদ্ধাদের দায়িত্ব পালনে তাঁদের সাহস ও বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানসহ হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মীগণ করোনা মোকাবিলায় দায়িত্ব পালনে হয়েছেন প্রশংসিত। তদুপরি ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যে-কোনো মৃতদেহের দাফনে বন্ধুর মতো এগিয়ে এসেছে বীর বাঙালির দামাল সন্তানরা। সাহসী এই স্বেচ্ছাসেবকরাই করোনায় মৃতের লাশ দাফন করাকে জীবনের সবচেয়ে বড়ো ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। এমন কঠিন কিন্তু মানবিক কাজে যুক্তদের নিয়ে 'অদম্য করোনাযোদ্ধা : অন্তিম যাত্রাপথের বন্ধু' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–২৫

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে মে ২০২০ পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন–পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

[২৪শে মে ২০২০]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের জনগণসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ঈদ মোবারক।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

আমি স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই– মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপটেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও দশ বছরের ছোট্ট শেখ রাসেলকে, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসেরসহ সকল শহিদকে।

প্রিয় দেশবাসী,

কথায় আছে 'বিপদ কখনও একা আসে না'। করোনা ভাইরাসের এই মহামারির মধ্যে গত বুধবার রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগসহ উপকূলীয় জেলাগুলোতে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' আঘাত হানে।

আল্লাহর অশেষ রহমত এবং আমাদের আগাম প্রস্তুতির কারণে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে যাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি না হয়, সেজন্য বিভিন্ন দ্বীপ, চরাঞ্চল এবং সমুদ্র-উপকূলে বসবাসকারী ২৪ লাখেরও বেশি মানুষকে এবং প্রায় ৬ লাখ গবাদিপশু আমরা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি।

সর্বাত্মক প্রস্তুতি সত্ত্বেও গাছ ও দেয়াল চাপায় বেশ কয়েকজন মানুষ মারা গেছেন এবং বহু ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। আমি তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আমরা ইতোমধ্যেই ত্রাণসামগ্রী বিতরণ শুরু করেছি এবং ঘরবাড়ি মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

ঈদুল ফিতর মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব হলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশে সকল ধর্ম এবং বর্ণের মানুষ এ উৎসবে সমানভাবে শামিল হয়ে থাকেন। ঈদের আনন্দ সকলে ভাগাভাগি করে উপভোগ করেন।

কিন্তু এবছর এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হচ্ছে। করোনা নামক এক প্রাণঘাতী ভাইরাস সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। তার উপর ঘূর্ণিঝড় আম্পানের তাণ্ডবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এবছর আমরা সকল ধরনের গণ-জমায়েতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছি। কাজেই স্বাভাবিক সময়ের মতো এবার ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করা সম্ভব হবে না।

ঈদগাহ ময়দানের পরিবর্তে মসজিদে মসজিদে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদের নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ইতঃপূর্বে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস এবং বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানও জনসমাগম এড়িয়ে রেডিও, টেলিভিশন এবং ডিজিটাল মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

সবাইকে আমি ঘরে বসেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে সামর্থ্যবানদের প্রতি আহ্বান জানাই, এই দুঃসময়ে আপনি আপনার দরিদ্র প্রতিবেশী, গ্রামবাসী বা এলাকাবাসীর কথা ভুলে যাবেন না।

আপনার যেটুকু সামর্থ্য আছে তাই নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান। তাহলেই ঈদের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে আপনার ঘর এবং হৃদয়-মন।

প্রিয় দেশবাসী,

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের যারা সামনে থেকে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

শুভেচ্ছা জানাই পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দকে– যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ত্রাণসামগ্রী বিতরণসহ সরকারের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

অনেক ক্ষেত্রে করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির দাফন ও সৎকারের ব্যবস্থাও তাদের করতে হচ্ছে। সংবাদ কর্মীগণ সংক্রমণের ঝুঁকি উপেক্ষা করে করোনা পরিস্থিতি তুলে ধরছেন এবং মানুষকে সচেতন করতে সহায়তা করছেন। তাদেরও ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এসব কাজ করতে গিয়ে আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মী এবং সংবাদ কর্মী করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।

বেশ কয়েকজন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য, প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং ব্যাংক ও সংবাদ কর্মী ইতোমধ্যে মারা গেছেন। আমি তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

এসব কর্মহীন মানুষের সহায়তার জন্য সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খাদ্য সহায়তা ছাড়াও দেওয়া হচ্ছে নগদ অর্থ। এ পর্যন্ত ১ লাখ ৬২ হাজার ৮৬৭ মেট্রিক টন চাল এবং নগদ ৯১ কোটি ৪৭ লাখ ৭২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১০ কেজি টাকা দরে বিক্রির জন্য ৮০ হাজার মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মে মাসে দরিদ্র পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ৫০ লাখ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে তারা এই চাল কিনতে পারবেন। কাজ হারিয়েছেন কিন্তু কোনো সহায়তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নন এ ধরনের ৫০ লাখ পরিবারকে আড়াই হাজার টাকা করে মোট ১,২৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য দু দফায় ১৭ কোটিরও বেশি এবং সারা দেশের মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিনদের জন্য ১২২ কোটি ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহায়তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হবে, ততদিন এসব কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। অনেক সদাশয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দরিদ্র জনগণের সহায়তায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণে এগিয়ে এসেছেন। আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০শে মে ২০২০ গণভবনে স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যসহ বিদেশে বসবাসকারী সাড়ে ৬ শোরও বেশি বাংলাদেশি ভাইবোন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আমি সকলের রুহের মাগফিরাত এবং আত্মার শান্তি কামনা করছি।

ইতোমধ্যে আমরা চিকিৎসা সক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছি। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাসপাতালকেও আমরা করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় সম্পৃক্ত করেছি।

জরুরি ভিত্তিতে ২ হাজার ডাক্তার এবং ৫ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। হাসপাতালগুলোতে সকল ধরনের রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারির কারণে সারা বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। অগণিত মানুষের প্রাণহানি ছাড়াও এই মহামারি মানুষের রুটিরুজির উপর চরম আঘাত হেনেছে।

সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য জরুরি কিছু সেবা ছাড়া বন্ধ করে দিতে হয়েছে অফিস-আদালত, কলকারখানা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ সবকিছু। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। হারিয়েছেন তাদের রুটিরুজির সংস্থান।

প্রিয় দেশবাসী,

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুনরায় সচল করতে আমরা ইতোমধ্যে ১ লাখ ১ হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি যা জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশ।

রপ্তানিমুখী শিল্প, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প, কৃষি, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন খাতসহ ১৮টি অর্থনৈতিক খাতকে এসব প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় আনা হয়েছে।

কাজ হারানো যুবক ও প্রবাসী ভাইবোনদের সহায়তার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনকে ৫০০ কোটি টাকা করে সর্বমোট ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

এই দুর্যোগ মুহূর্তে বোরো ধানের বাম্পার ফলন আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। এ বছর প্রায় ৪৮ লাখ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ করা হয়। ইতোমধ্যে বোরো ধান কাটা-মাড়াই প্রায় শেষ।

এই দুর্যোগ মুহূর্তে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য আমি কৃষক ভাইবোন এবং কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই এপ্রিল ২০২০ গণভবনে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব ও উত্তরণের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন–পিআইডি

কৃষকগণ যাতে ধানের ন্যায্য মূল্য পান সেজন্য ইতোমধ্যেই আমরা ধান-চাল সংগ্রহ শুরু করেছি। চলতি মৌসুমে ২২.২৫ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হবে যা গত বছরের তুলনায় ২ লাখ মেট্রিক টন বেশি।

ধান কাটা-মাড়াইয়ে সহায়তার জন্য আমরা কৃষকদের ভরতুকি মূল্যে কম্বাইন্ড হারভেস্টর এবং রিপার সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। এজন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। মাত্র ৪ শতাংশ সুদে কৃষকদের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আমি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলাম ধান কাটা-মাড়াইয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে। আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে নিয়ে তারা কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছে। একইসঙ্গে কৃষকলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ধান কাটায় সহায়তা করেছে। এজন্য কৃষকদের কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। কৃষকেরা দ্রুত ধান ঘরে তুলতে পেরেছেন। আমি এসব ছাত্রলীগ কর্মীসহ যারা কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানাই।

প্রিয় দেশবাসী,

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের এই মহামারি সহসা দূর হবে না। কিন্তু জীবন তো থেমে থাকবে না। যতদিন না কোনো প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন করোনা ভাইরাসকে সঙ্গী করেই হয়ত আমাদের বাঁচতে হবে। জীবন-জীবিকার স্বার্থে চালু করতে হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশই ইতোমধ্যে লকডাউন শিথিল করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ অনির্দিষ্টকালের জন্য মানুষের আয়-রোজগারের পথ বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে তো নয়ই।

রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল বাবদ ৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা কার্যকর করা হয়েছে। যারা কাজে যোগ দিতে পারেননি, তারাও শতকরা ৬০ ভাগ বেতন পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে এ প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে বেতনভাতা পরিশোধ করা শুরু হয়েছে।

দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় একদিকে মালিকদের আয় যেমন বন্ধ হয়েছে, তেমনি কর্মচারীরাও বিপাকে পড়েছেন। বেশিরভাগ দোকান মালিকের কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নেই। ফলে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

আমরা ঈদের আগে স্বাস্থ্যবিধি এবং অন্যান্য নিয়মনকানুন মেনে কিছু কিছু দোকানপাট খুলে দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছি। যারা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুলেছেন এবং যারা দোকানে কেনাকাটা করতে যাচ্ছেন, আপনারা অবশ্যই নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন। ভিড় এড়িয়ে চলবেন।

আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে। মনে রাখবেন, আপনি সুরক্ষিত থাকলে আপনার পরিবার সুরক্ষিত থাকবে, প্রতিবেশী সুরক্ষিত থাকবে, দেশ সুরক্ষিত থাকবে।

প্রিয় দেশবাসী,

ঝড়-ঝঞ্ঝা-মহামারি আসবে। সেগুলো মোকাবিলা করেই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজন জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সংকট যত গভীরই হোক জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকলে তা উতরানো কোনো কঠিন কাজ নয়। এই সত্য আপনারা আবারো প্রমাণ করেছেন। আপনাদের সহযোগিতা এবং সমর্থনে আমরা করোনা ভাইরাস মহামারির আড়াই মাস অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছি। যতদিন না এই সংকট কাটবে, ততদিন আমি এবং আমার সরকার আপনাদের পাশে থাকব, ইনশাল্লাহ।

প্রিয় দেশবাসী,

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আনন্দ উৎসবের জন্য মহান আল্লাহতায়ালা ঈদুল ফিতরের দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক মাসের কষ্ট আর ক্লান্তিকে ভুলে গিয়ে এদিন আনন্দ ও খুশিতে মেতে উঠার দিন।

এ বছর আমরা সশরীরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে বা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে না পারলেও টেলিফোন বা ভার্চুয়াল মাধ্যমে আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নিব।

এভাবেই সকলের সঙ্গে একযোগে আল্লাহ প্রদত্ত এই মহান নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব।

বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি, ইসলামিভাবের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী গানের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি–

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানী তাগিদ।
তোর সোনা-দানা, বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ
দে যাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিঁদ
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন। ঘরে বসেই ঈদের আনন্দ উপভোগ করুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আবারো সবাইকে ঈদ মোবারক।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ

নাজমা ইসলাম

১৯৪৭ সালে পাক-ভারত উপমহাদেশ বিভক্তি হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে স্বাধীনতা লাভ করে। চলে দুই দশক ধরে শোষণ ও নিপীড়ন। পূর্ব পাকিস্তান হয়ে পরে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৬ সাল। লাহোরে পূর্ব পাকিস্তানের জননন্দিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারিতে বিরোধী দলের নেতাদের সম্মেলনে উত্থাপনের জন্য ছয় দফা বিষয় নির্ধারণী কমিটিতে জমা দেন। সম্মেলনে উত্থাপনের জন্য ছয় দফা গৃহীত না হওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ই ফেব্রুয়ারির সম্মেলন বর্জন করে। পরবর্তীতে সম্মেলনের বাইরে এসে সংবাদ সম্মেলন করে ছয় দফা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু।

শেখ মুজিবুর রহমান নিজের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা কর্মসূচি' শীর্ষক পুস্তিকা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে প্রচার করেন। সারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জায়গায় ছয় দফার কর্মসূচি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলেন। ছয় দফার জনপ্রিয়তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে ভাবিয়ে তোলে।

পাকিস্তানিরা এই কর্মসূচিকে ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। বঙ্গবন্ধুসহ হাজার হাজার কর্মীকে জেলে ঢোকানো হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ছয় দফার দাবিতে হরতাল ডাকা হয়।

বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হয়। পাকিস্তানি শাসকদের ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার স্বাদ ততদিনে বিস্বাদে পরিণত হতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়তে থাকে। শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধানও বাড়তে থাকে। ঠিক সেই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি প্রণয়ন করেন। মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে এটি ছিল ফেডারেল ব্যবস্থার নতুন কাঠামো। লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে পুস্তিকা প্রকাশ করেন ছয় দফা প্রচারের লক্ষ্যে। শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় তাঁর প্রচারে পাশে পান

ছয় দফার প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা ছয় দফার মধ্যে দেশ বিভক্তি তথা ষড়যন্ত্রের আভাস পেল। বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয়। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মূল ইশতাহারে ছিল ঐতিহাসিক ছয় দফা। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয় আওয়ামী লীগ। পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করল না পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ। নিধনযজ্ঞ চালানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো তারা। এল ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত। ১৯৬৬ সাল থেকে বাংলার ইতিহাসের প্রতিটি পর্ব বিশ্লেষণ করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে– ছয় দফা বাঙালিকে সুসংগঠিত এবং একটি বিপ্লবের জন্য তৈরি করেছিল। ফলাফল স্বরূপ আমরা পেলাম স্বাধীন রাষ্ট্র, মানচিত্র ও পতাকা।

কী ছিল ঐতিহাসিক সনদ ছয় দফায়? ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর চাওয়া পূর্ব পাকিস্তানের সিংহভাগ জনগণের চাওয়া ছিল। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও এ অঞ্চল থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে আইন সভা ও শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হয়নি। ১৯৪৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং তিনিও ছিলেন উর্দুভাষী। ১৯৫৮ সালে যে শাসনতন্ত্র চালু হয়েছিল তা পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করে।

১৯৬২ সাল। আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতি শাসিত

ছয় দফার দাবিতে মিছিল

সরকার প্রবর্তন এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ঠিক তার ৪ বছর পরেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

সর্বস্তরের জনগণ ছয় দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের বিপুল জয় সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

প্রশাসনিক বৈষম্যও ছিল দুই প্রদেশের মধ্যে প্রবল। সামরিক ও বেসামরিক চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে বৈষম্য ছিল তীব্রতর। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মুদ্রা ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্টেট ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অর্থ পাচার হতো অবাধ গতিতে। উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে জমা থাকত। যার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে ওঠেনি। মোট রাজস্বের শতকরা ৯৪ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হতো। বিদেশি মিশনগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় ঐ অঞ্চলের আয় বেড়েই চলছিল। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চেয়ে দ্বিগুণ ছিল।

এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা, কৃষি ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে বরাবরই উদাসীন ছিল। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক বৈষম্য সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি সংবলিত এক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচিই ছয় দফা, বাঙালির মুক্তির সনদ। এ নিবন্ধে ছয় দফার প্রতিটি কর্মসূচির আলোচনার দাবিদার।

১. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়তে হবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২. দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। বাকি বিষয়গুলো অঙ্গরাজ্যের পূর্ণ ক্ষমতায় থাকবে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটো আলাদা অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন থাকতে হবে। দুটি অঞ্চলের জন্য দুটো স্বতন্ত্র 'স্টেট ব্যাংক' থাকবে।

৪. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৫. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে। এর নির্ধারিত অংশ কেন্দ্রকে দেবে। তারা বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলাপ -আলোচনা ও চুক্তি করতে পারবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা নিজস্ব গণবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের দাবি করা হয়।

শেখ মুজিব ছয় দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় জনসংযোগ শুরু করেন। এ সময় তাঁকে খুলনা, যশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বার বার গ্রেফতার করা হয়। বছরের প্রথম তিন মাসে তিনি আটবার গ্রেফতার হন। ৮ই মে নারায়ণগঞ্জে জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।

৭ই জুন শেখ মুজিব ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গিতে পুলিশের গুলিতে শ্রমিকনেতা মনু মিয়াসহ বেশ কয়েকজন নিহত হন এবং বহু নেতাকর্মী আহত হন। পুলিশ দেড় হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। দুপুরে আদমজি, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকরা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। ইপিআরবাহিনী একটি শোভাযাত্রায় গুলিবর্ষণ করে। বেলা ১১টায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। হরতালের পরের দিন গুলিতে আহত একজনের মৃত্যু হয়। সরকারি ভাষ্য অনুসারে, ১১ জনের মৃত্যু স্বীকার করে; কিন্তু নিহতের সংখ্যা বেশি ছিল। ঐদিন সন্ধ্যার পর সরকার কারফিউ জারি করে। সংবাদ জগতের নির্ভীক সৈনিক পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ *ইত্তেফাকের* সবচেয়ে জনপ্রিয় অঙ্গ 'রাজনৈতিক মঞ্চের' লেখক মোসাফির তথা তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে আইয়ুব-মোনেম চক্রের নির্দেশে পুলিশ ১৬ই জুন ধানমন্ডিস্থ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। একই দিনে *দৈনিক ইত্তেফাকের* প্রেস ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থ 'নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। ২০ মাস জেলে আটক রাখার পর ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি শেখ মুজিবকে সামরিক হেফাজতে নেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে বিচার শুরু করে। কিন্তু গণ-আন্দোলনের চাপে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তানি শাসকরা বুঝেছিল, ছয় দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে এক পাকিস্তান থাকবে না। তৎকালীন ৫টি প্রদেশে ৫টি স্বায়ত্তশাসন বিদ্যমান হবে। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, ছয় দফা কেবলমাত্র দাবি আদায়ের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান প্রণয়ন করেননি। শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা এবং ছয় দফা ছিল স্বাধীনতা অর্জনের কৌশল।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

জাতির পিতা ও জাতীয় কবি

শাফিকুর রাহী

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দেশপ্রেম, মানবপ্রেম আর ধর্মচেতনার নাক্ষত্রীয় আভায় উদ্ভাসিত মনোলোক ধারণ করেছিল বাঙালির মহিমান্বিত বীরত্বের বিরল অমরগাথা। তিনি বাঙালির শৌর্যবীর্যের গৌরবগাথা। তাঁর মননে-ধ্যানে-জ্ঞানে লালন করে জানান দিলেন বাঙালির মুক্তি ও বিজয় অনিবার্য। কাজী নজরুল ইসলামের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এনেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবল প্রজ্ঞা, পরম মানবিকতা, মহত্তম উদারতার ফলে আজ বাংলাদেশের জাতীয় কবির সর্বোচ্চ সম্মানিত আসন অলংকৃত করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম, যা সমগ্র জাতির কাছে অতীব গৌরবের বিষয়। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আজ বাংলাদেশের রণসংগীত আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আমাদের জাতীয় সংগীত, এসবই হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম আর মানবপ্রেমের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শুভলগ্নে, সুনির্দিষ্ট নির্দেশে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান-কবিতায় যেভাবে মুগ্ধ হয়েছেন, কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান-কবিতায়ও দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়েছেন বিধায় মহান মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অমন যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

জাতীয় কবির সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ চব্বিশ বছরের আন্দোলন সংগ্রাম আর ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ প্রাণের আত্মদান আর দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাঙালি জাতি অর্জন করে প্রিয় স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বড়ো বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, 'মাই ডিয়ার সিস্টার আপনার কাছে আমার একটি আবদার আছে আপনি যদি রাখেন তাহলে বলতে পারি'। 'নিশ্চয়ই বলবেন– আমি অবশ্যই তা রাখবো'। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু বললেন যে, বিদ্রোহী কবিকে আমাকে দিতে হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও সাথে সাথে বললেন– হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি চাইলে তা-ই হবে, কবে কীভাবে আনতে চান সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর বিশ্বাস রেখে বঙ্গবন্ধু সেভাবেই বাংলাদেশ থেকে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুস্তাফা সারওয়ারকে প্রধান করে একটি কমিটি ভারতে পাঠিয়ে দিলেন ১৯৭২ সালের মে মাসে।

ভারতে গিয়ে কমিটির লোকজন সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত বলার পর ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে কবিকে বাংলাদেশে আনার প্রস্তুতি চলে। ইতোমধ্যে ভারতের নজরুলভক্তরা বিষয়টি জানতে পেরে তাতে বাধা দিতে চাইল। বাংলাদেশে কবিকে নেওয়া যাবে না বলে তারা সেখানে মিটিং, মিছিল ও প্রতিবাদ শুরু করলে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে সময়সূচিও বদলানো হলো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতের বেলায় গোপনে বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় কবিকে। সেই রাতেই ২৪শে মে কবির ৭৩তম জন্মদিনে বাংলাদেশে এসে পৌঁছালে বঙ্গবন্ধু কবিকে জন্মদিনের ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে কবির সম্মুখে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। বাকরুদ্ধ কবির অসুস্থতা দেখে বঙ্গবন্ধুর অনেক খারাপ লেগেছিল। কবিও তখন দীর্ঘসময় ধরে অবাক দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়েছিলেন।

প্রজ্ঞা, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম সর্বোপরি বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের মুক্তির অগ্রদূত বঙ্গবন্ধু। বিদ্রোহী কবির চিন্তা-চেতনা আর বঙ্গবন্ধুর বিপ্লবী কণ্ঠস্বর বারবার উচ্চারিত হয়েছে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে। সাম্য ও সম্প্রীতির মহাবন্ধনে সমগ্র মানব জাতিকে এক কাতারে দাঁড় করানোর অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে তাদের সকল কর্মে ও উচ্চারণে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, সারা পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত– একটি শোষিত আরেকটি শাসিত। তাঁরা দুজনই কিন্তু শোষিতের পক্ষেই সবসময় উচ্চকিত ছিলেন।

বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গবন্ধু যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা কেউ কোনোদিন ভুলতে পারবে না। অনন্তকাল বাঙালি জাতির ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর নাম। জাতির পিতা আর জাতীয় কবির সুদীর্ঘ অহিংস রক্তপাতহীন মানবিক আন্দোলন সংগ্রামের মূল সুরই ছিল অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন সাম্য-শান্তি আর প্রগতির চিন্তা-চেতনায় কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠন। এই আকাঙ্ক্ষায় সারাটি কাল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তির লড়াইয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। গণমানুষের অধিকার আদায়ের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা অনেক নির্যাতিত হয়েছেন। তৎকালীন শাসকদের হাতে গ্রেফতার হয়ে দুজনই বহুবার কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াতে হয়েছে বহুবার। শারীরিক, মানসিকভাবে অনেক নির্যাতন-নিপীড়ন করেও তাঁদেরকে কখনো দমাতে পারেনি কোনো স্বৈরশাসকগোষ্ঠী।

একজন হলেন বিদ্রোহী ও মানবতার কবি, আরেকজন হলেন দেশপ্রেমী ও রাজনীতির কবি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্রোহী কবি নজরুলের সৃজনশীল মানসকে ধারণ করেছিলেন আর মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন বলেই তো আজ বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। জাতীয় কবি নজরুলের নাম এলে সেখানে বঙ্গবন্ধুর নাম আসে। কারণ বঙ্গবন্ধুর বিশাল উদার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবল প্রজ্ঞা আর পরম মানবিক গুণাবলি ও মহতী উদ্যোগের ফলেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

একবার বঙ্গবন্ধু কবি নজরুলের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর এক ভাষণে বলেছেন– 'নজরুল বাঙালির স্বাধীন সত্তার ঐতিহাসিক রূপকার'। আমরা যাঁকে বলে থাকি বাঙালির নব জাগরণের কবি নজরুল, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী উচ্চারণ আর প্রেম-সংগীতের বেলায় গানের 'বুলবুল'। আমরা বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হবো আর নজরুলের প্রতিবাদী গান-কবিতায় বাঙালি জাতি জেগে উঠবে, জাগ্রত হবে মানবিক চেতনায়।

লেখক: কবি, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, ক্ষুদ্রপ্রাণ মুজিব সৈনিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হোটেল সিপ্রিয়ানি লি স্পেসিয়ালিতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ)-এর নির্বাহী পরিচালক Achim Steiner-*এর কাছ থেকে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেন–পিআইডি*

পরিবেশ দিবস ও জলবায়ু কূটনীতি

ফারিহা রেজা

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবছর পরিবেশ দিবসের ৪৭তম আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল কলম্বিয়া। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে স্পেনের মাদ্রিদে জলবায়ু বিষয়ক কোপ (Conference of Parties) সম্মেলন চলার মধ্যেই জাতিসংঘের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। কলম্বিয়াকে এ সম্মেলনে সহযোগিতা করছে জার্মানি। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ হয়েছে 'প্রকৃতির জন্য সময়'।

কলম্বিয়ার আয়োজকরা বলেন, বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যখন প্রায় দশ লক্ষাধিক উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জীববৈচিত্র্যকে থিম ঘোষণা করে পরিবেশ বাঁচানোর সংকল্পে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য এটিই সঠিক সময় বলে মনে করছে জাতিসংঘ। ১৯৭৪ সালে প্রথম উদ্‌যাপনের সময় থেকেই প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের জন্য নির্দিষ্ট একটি থিম বা বিষয় নির্ধারণ করে দেয় জাতিসংঘ। সংস্থাটি বলছে, সমসাময়িক পরিবেশগত উদ্বেগের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই থিম নির্ধারণের ভাবনাটি এসেছে। ১৯৭৪ সালে প্রথম পরিবেশ দিবসের থিম ছিল– 'Only one Earth'। আয়োজক শহর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের স্পোকান।

আমরা যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি, যে বাতাসে শ্বাস নিই, তৃষ্ণায় পানি পান করি এবং জলবায়ু যেটি আমাদের গ্রহকে বাসযোগ্য করে তোলে– এসবই প্রকৃতির নিঃস্বার্থ অবদান। প্রতিবছর সামগ্রিক গাছপালা আমাদের বায়ুমণ্ডলের অর্ধেকের বেশি অক্সিজেনের যোগান দেয় এবং একটি পরিপক্ক গাছ প্রায় ২২ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে বিনিময়ে অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে মানুষের ক্লান্তিহীন উপকার করছে। বাঁচিয়ে দিচ্ছে মানুষের প্রাণ। প্রকৃতি আমাদের উদারভাবে দান করছে আর আমরা বিনিময়ে প্রকৃতিতে বিপর্যয় ঘটাচ্ছি। জাতিসংঘ বলছে, প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্কের এই টানাপোড়েন মেটাতে পরিবেশ দিবস পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এতে সামান্য হলেও মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের মতো অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এলডিসি বা অনুন্নত দেশগুলো জলবায়ু কুফলভোগী অথচ এর জন্য দেশগুলো দায়ী নয়।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাড়ছে ভয় ও শঙ্কা। সারা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পরিমিতি বোধের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির ওপর নির্বিচারে চলছে নিধনযজ্ঞ। UNFCCC শিল্পোন্নত দেশসমূহের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের যে অঙ্গীকার বিধৃত হয়েছে তাকে আরো সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ করতে এবং আন্তর্জাতিক আইনে বাধ্যবাধকতা আনার জন্য ১৯৯৭ সালে সর্বসম্মতভাবে 'কিয়োটো প্রটোকল' গৃহীত হয়। বর্তমানে কিয়োটো প্রটোকলের কার্যকারিতা নেই বললেই হয়। কিয়োটো প্রটোকলের সাথে সংযুক্ত এনেক্স-বি তালিকায় প্রতিটি দেশ শিল্পোন্নত দেশের জন্য ভিত্তি বছর ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে কী পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ কমাবে তার শতকরা হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলেও পৃথিবীর শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে এ প্রটোকলে স্বাক্ষর করলেও পরে কংগ্রেসের অনুসমর্থন না করায় দেশটি এই প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা থেকে সরে যায়। প্রটোকলের প্রথম পর্যায়ের শেষ পর্বে ২০১২ সালে কানাডাও প্রটোকল থেকে বের হয়ে আসে। অন্যদিকে কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্যায়ের (২০১৩-২০২০) জন্য গৃহীত সংশোধনীতে জাপান, রাশিয়া ও নিউজিল্যান্ড অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের শতকরা ১৫

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে জুন ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৯ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা ২০১৯ অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৮ ও বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০১৯-এর পুরস্কারপ্রাপ্তদেরকে ক্রেস্ট এবং সামাজিক বনায়নে অংশীদের লভ্যাংশের চেক প্রদান করেন–পিআইডি

ভাগ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অবশিষ্ট শতকরা ৮৫ ভাগ কোনো ধরনের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী ১৪৪টি দেশ কিয়োটো প্রটোকলের সংশোধন অনুসমর্থন না করায় অদ্যাবধি প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যকর হতে পারেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে বর্তমানে পৃথিবীর শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশ চীন এবং তৃতীয় কার্বন নিঃসরণকারী দেশ ভারত। বিশ্বের প্রথম ২০টি সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণকারী দেশের মধ্যে ১০টিই উন্নয়নশীল দেশ। এ অবস্থায় 'এনেক্স-১' ভুক্ত উন্নত দেশসমূহে বর্তমানে পৃথিবীর মোট কার্বন নিঃসরণের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগের জন্য দায়ী। বাকি ৬০ ভাগ দায়ী উন্নয়নশীল দেশ। একমাত্র ৪০ ভাগ কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।

২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ১৭তম ও ২০১৫ সালে

২১তম প্যারিসে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সকলের অংশগ্রহণমূলক ও আইনি বাধ্যবাধকতামুক্ত সর্বজনীন চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্মেলন বাংলাদেশসহ সব এলডিসি বা অনুন্নত তথা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে কনভেনশনের ১৯৫টি দেশের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে UNFCCC-এর আওতায় একটি জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি গৃহীত হয়, যা ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি নামে অভিহিত। ২০১৬ সালের স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রথম দিকেই ১৯৫টি সদস্যদের মধ্যে বাংলাদেশসহ ১৭৫টি দেশ চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্যারিস চুক্তি ছিল ঐতিহাসিক শুভ সূচনা। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করেছেন। প্যারিস চুক্তিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উপর অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন।

Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)-এর আলোকে (বিভিন্ন সেক্টরের সমন্বয়) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। পরিবেশে বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ৬ শতাধিক প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আমাদের সরকারের এ ধরনের যুগান্তকারী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীকে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করে।

জাতিসংঘের সদস্য দেশ হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও প্রতিবছর পালিত হয় পরিবেশ দিবস। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দিবসটির মূল আয়োজক। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতার মধ্যে এবার পরিবেশ দিবস ঘরে থেকেই উদ্‌যাপনের জোর দিয়েছে জাতিসংঘ। পরিবেশকে আমরা তার মতোই থাকতে দিব। পরিবেশ বেঁচে থাকবে নিজের মতো করে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতি এটাই আমাদের জানান দিচ্ছে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

লাহোর প্রস্তাব থেকে ছয় দফা
বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উন্মেষ

কে সি বি তপু

পাকিস্তানের লাহোরে বাংলার দুজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ কর্তৃক উত্থাপিত দুটি প্রস্তাব ইতিহাসে দুটি যুগান্তকারী ঘটনা। শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেও বটে। দুটি প্রস্তাবই বিশ্ব ইতিহাসকেও করেছে প্রভাবিত। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব এবং শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়, অন্যদিকে ছয় দফা প্রস্তাব সম্মেলনের বিষয় নির্ধারণী কমিটিতেই গৃহীত হয়নি তদুপরি বিচ্ছিন্নতাবাদের অজুহাতে হয়েছে সমালোচিত। তবে লাহোর প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাবের কার্যনির্বাহী কমিটি

উত্থাপনের দীর্ঘদিন পর মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মুদ্রণপ্রমাদ ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের জন্য রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তে একটি রাষ্ট্র নিশ্চিত করেন। ফলে লাহোর প্রস্তাব পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রস্তাবে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান শাসনামলে বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব সংবলিত ছয় দফা উত্থাপন করেন। এই ছয় দফাকে বাংলার জনগণের বাঁচার গণদাবিতে রূপান্তরিত করেন বঙ্গবন্ধু। ছয় দফা কর্মসূচির মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উন্মেষ ঘটেছিল। তাঁর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চূড়ান্ত পর্বে অর্জিত হয় বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতা।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হলে চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ সমর্থন করেন। অধিবেশনের শেষ দিন ২৪শে মার্চ প্রবল উৎসাহের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

অনেক ইতিহাসবিদের মতে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব এলাকাসমূহের মতো যে সকল অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সব অঞ্চলে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (স্টেটস) গঠন করতে হবে যার মধ্যে গঠনকারী এককগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। বাংলার মুসলমানগণ, যারা উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে নিজেদের আত্মপরিচয় খুঁজে ফিরছিল, পরিশেষে লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে তার সন্ধান পায়। লাহোর প্রস্তাব তাদেরকে একটি জাতীয় চেতনা প্রদান করে।

১৯৪১ সালের ১৫ই এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রে একটি মৌল বিষয় হিসেবে সন্নিবেশ করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত এটি লীগের প্রধান বিষয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উত্তরকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রধান প্রসঙ্গ ছিল পাকিস্তান।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করতে এবং স্বশাসনকে সহজতর করার সাহায্যকল্পে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে যখন মন্ত্রী মিশন ভারতে পৌঁছে, তখন ৭ই এপ্রিল দিল্লিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তাদের 'পাকিস্তান দাবি'র পুনরাবৃত্তি করতে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করতে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি চৌধুরী খালিকুজ্জামান, হাসান ইস্পাহানি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি উপকমিটি করে। চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রস্তাবের একটি খসড়া তৈরি করেন। অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে খসড়াটি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সামান্য পরিবর্তনের পর উপ-কমিটি এবং অতঃপর সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। 'স্টেটস' (States) শব্দটিকে একবচন শব্দ 'স্টেট' (State)-এ পরিবর্তন করা হয়। এ পরিবর্তন মূল লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। ১৯৪৬ সালে মুসলমান আইন প্রণয়নকারীদের দিল্লি সম্মেলনে যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হয় তাতে নিম্নোক্ত মূলনীতিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল: ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে বাংলা ও আসাম সমন্বয়ে এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সমন্বয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নিয়ে যে অঞ্চলসমূহ গঠিত, সে অঞ্চলসমূহকে নিয়ে একটি সার্বভৌম স্বাধীন 'রাষ্ট্র' গঠন করা হোক এবং কোনোরকম বিলম্ব ছাড়াই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার প্রদান করা হোক।

জিন্নাহ প্রথমে লাহোর প্রস্তাবের বহুবচনবাচক 'এস' (S)-কে 'সুস্পষ্ট মুদ্রণভ্রম' হিসেবে অভিহিত করেন। এতে জিন্নাহর প্রস্তাব নিম্নোক্ত রূপ ধারণ করে: আমাদের লক্ষ্য হলো ভারতের উত্তর-পশ্চিমে এবং বাংলা ও আসামকে অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের উত্তর-পূর্বে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করা।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উত্থাপিত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী তিনটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল। প্রস্তাবে বলা হয়, যখন ব্রিটিশরা চলে যাবে তখন ভারতীয় উপমহাদেশে তিনটি রাষ্ট্র হবে এবং ভারত ছাড়াও পশ্চিম ও পূর্ব অংশে দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হবে। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'ছাপার ভুল' দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রসমূহ শব্দটিকে 'রাষ্ট্র'তে রূপান্তর করে সেই ঐতিহাসিক দলিল 'লাহোর প্রস্তাব' পালটে ফেলেন।

লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন সংকটময় পরিস্থিতিতে লাহোর প্রস্তাবের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার স্বাদ অর্জনের জন্য পূর্ব বাংলার মানুষ অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। পাকিস্তান শাসনামলে লাহোর প্রস্তাবের মূলভিত্তি থেকে বিচ্যুতিতেই বাঙালির মোহভঙ্গ হয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন পায়নি, বরং পেয়েছে বৈষম্য ও নিপীড়ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতেই এসেছে ছয় দফা। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোর শহরেই লাহোর প্রস্তাবের আলোকে স্বায়ত্তশাসন দাবি সংবলিত প্রাণের দাবি ছয় দফা উত্থাপিত হয়। ছয় দফা উত্থাপন করেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

মূলত ছয় দফা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচি। তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সোচ্চার হন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতারা তাসখন্দ-উত্তর রাজনীতির গতিধারা নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারি লাহোর পৌঁছান। পরদিন সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির সভায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি হিসেবে 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬ই ফেব্রুয়ারি সম্মেলন বর্জন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানি পত্রপত্রিকায় ছয় দফার বিবরণ ছাপিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরূপে চিত্রিত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় ছয় দফা। ছয় দফা দাবি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা গ্রহণ করতে পারেননি পশ্চিম এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতারাও। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান দমবার পাত্র নন। লাহোর ছাড়ার আগে বঙ্গবন্ধু ১০ই ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করে জোরালো কণ্ঠে বলেন,

> ছয় দফা আমাদের বাঁচার সনদ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরো জোরদার হয়েছে। পাকিস্তানকে স্বনির্ভর করতে হলে সর্বোচ্চ সম্ভব স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা জরুরি। বহিরাক্রমণ ঠেকাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জরুরি।

১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। বিমানবন্দরেই তিনি সাংবাদিকদের সামনে ছয় দফা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন। ছয় দফার মূল কথাই ছিল– ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফেডারেল সরকার পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বাকি সব নীতি অঙ্গরাষ্ট্রগুলো প্রণয়ন ও পরিচালনা করবে।

আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটিতে ছয় দফা দাবি পাস করা হয়। লাহোর থেকে ফেরার পর ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। যেখানে শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা গৃহীত হয়।

পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে ছয় দফা দাবিনামা জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফার পক্ষে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করে আওয়ামী লীগ। বাংলার মানুষ ব্যাপকভাবে ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানান। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল, মে ও জুনে ছয় দফার দাবিকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীকে ভাবিয়ে তোলে।

ছয় দফা দাবি পেশের পর তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে লাহোর থেকে ফিরছেন বঙ্গবন্ধু

পরবর্তীতে ছয় দফা ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের সত্তরের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছয় দফার জনপ্রিয়তা আওয়ামী লীগকে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী করেছে। ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ। এই ছয় দফার পথ বেয়েই অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা।

ছয় দফা বাংলার রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা কেন্দ্রিক আপোশহীন রাজনীতি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের জন্য একটি টার্নিং-পয়েন্ট। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের ইতিহাসে ছয় দফার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় ছয় দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার এক দফা দাবিতে রূপান্তরে বাংলার ইতিহাসে ঘটেছে দিক-পরিবর্তন। 'লাহোর প্রস্তাবে বাংলার মুক্তি নিহিত'– এমন অভিমত কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ব্যক্ত করলেও সকল ইতিহাসবিদ স্বীকার করেন– 'বঙ্গবন্ধুর ছয় দফায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত'। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে ও বিচক্ষণতায় স্বাধীনতার এই বীজ মহীরূহে পরিণত হয়।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

ঘরে বসে মুজিববর্ষ পালন করতে পারি যেভাবে

আজহারুল আজাদ জুয়েল

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা ছিল দেশজুড়ে ব্যাপক জনসমাগম ঘটিয়ে বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে। আতশবাজি হবে, বর্ণাঢ্য র‍্যালি, কনসার্ট, সভা, জনসভা, ক্রীড়া-সংস্কৃতির নানান প্রতিযোগিতাসহ বর্ণাঢ্য সব আয়োজন থাকবে। জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপস্থিতি থাকবে এবং এক জমকালো আয়োজনে বাঙালির স্বাধীনতার মহানায়কের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌বোধন হবে।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ

কিন্তু বিশ্বগ্রাসী করোনার আক্রমণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে সীমিত পরিসরে। ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। একশত বছর আগের এই দিন বাংলা মায়ের কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন এই ক্ষণজন্মা পুরুষ, যিনি বাঙালি জাতিকে গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত করেছিলেন ১৯৭১ সালে। তিনি বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শেকল ও গ্লানি থেকে মুক্ত করতে বার বার কারাগারে গিয়েছিলেন। একের পর এক কারাভোগ করে করে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। তাঁর ৫৫ বছরের জীবন সংগ্রামের ১৩ বছরের বেশি কারাগারেই কেটেছে। তারপরও কখনো তিনি দমেননি। তিনি প্রজ্ঞা ও কৌশলী রাজনীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে বাঙালি জাতিকে এক মোহনায় ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং ঘোষণা দিয়েছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তাঁর সেই ঘোষণার পর বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সেই কালজয়ী মহানায়কের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য গোটা জাতি যখন পুরোমাত্রায় প্রস্তুতি নিয়েছিল তখুনি আঘাত হেনেছে মরণব্যাধি কোভিড-১৯ ভাইরাস– যা করোনা নামে অধিক পরিচিতি পেয়েছে।

সারা বিশ্বেই বেড়েই চলেছে করোনা রোগীর সংখ্যা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন যে, পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সিদের জন্য করোনা ঝুঁকিপূর্ণ। এই বয়সি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। যাদের ডায়াবেটিকস আছে, অ্যাজমা আছে, যারা প্রায় ইনফ্লুয়েনজা কিংবা হাঁচি-কাশিতে আক্রান্ত হন, যাদের হার্টের সমস্যা আছে এমন ব্যক্তিদের জন্য করোনা বিপজ্জনক।

করোনায় শিশুদের আক্রান্তের হার কিছুটা কম। শিশুরা যদি এরকম প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে পরিবারের অবস্থা কীরকম হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। এর মধ্যেই সরকার নিজস্ব উদ্যোগেই মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত প্রায় সব কর্মসূচি সীমিত এবং অনেক কর্মসূচি স্থগিত করেছে। অন্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও আকাশপথ এবং সীমান্ত প্রায় সিল করে দিয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে। একই সময়ে সিনেমা হলগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। আরো নানা রকম কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১৭ই মার্চ থেকে আমরা 'মুজিববর্ষ' পালন শুরু করেছি। তবে বিগত বছরগুলোয় বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালনের সময় যে রকম দৃশ্য ছিল, এবার ছিল তার ভিন্ন চিত্র। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, দিনাজপুর-এর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য সকাল সাড়ে ৭টায় দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় তেমন ভিড় নেই। ৮-১০ জন করে লোক আসছেন এবং বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে চলে যাচ্ছেন। বিগত বছরগুলোয় এই চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সময় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। হাজারো লোকের উপস্থিতি অনুষ্ঠানমালায় প্রাণচাঞ্চল্য এনেছিল। করোনা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং সাধারণ মানুষের মাঝে বিরাজমান আতঙ্ক এবার পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে।

এই করোনাকালের অবসরে যে কাজগুলো করা যেতে পারে, তা হলো– ১. ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজেদের পড়াগুলো ঠিকমতো পড়তে পারে। ২. ছাত্রছাত্রীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুর লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* এবং *আমার দেখা চীন* বই তিনটি পড়তে পারেন। ৩. ছাত্রছাত্রীসহ সকল মানুষ বঙ্গবন্ধুর ওপর বিভিন্ন লেখকের লেখা বই পড়ে তাঁর জীবন, দর্শন ও আদর্শ জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবনচরিত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারে। ৪. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাই বাড়িতে বসে বিভিন্ন লেখকের লেখা মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের ইতিহাসভিত্তিক বই পড়তে পারে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে সবাই যদি পড়ালেখার মধ্যে থাকি, জ্ঞানার্জনের ভেতর থাকি, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পর্কে জানি অথবা জানার চেষ্টা করি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যারা দেখেনি, তারা সে সম্পর্কে জানতে পারেন, বঙ্গবন্ধুকে জানতে পারেন তাহলেই প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি।

আমরা করোনা নিয়ে সমস্যায় আছি। এই সমস্যা মোকাবিলা করা আমাদের এই মুহূর্তের এক নম্বর করণীয়। তাই পরিষ্কার-পচ্ছিন্নতা বজায় রাখা এবং বারে বারে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিকল্প এখন নাই। মাস্ক পড়ে নিজেকে এবং অন্যকে বিপদমুক্ত রাখতে পারি। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে নিশ্চিতভাবে ভালো থাকব বলে আশা করা যায়। নিজেকে ভালো ও সুস্থ রেখে, বই পড়ে, জ্ঞানার্জন করে যদি 'মুজিববর্ষ' পালন করা যায় তাহলে সেটা হবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক

আলোকিত পথিকৃৎ আনিসুজ্জামান

শ্যামল দত্ত

এক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের পরিচয় নানাভাবে দেওয়া যেতে পারে। তিনি দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক, সংবিধানের অনুবাদক এবং দেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের এক অনন্য পথিকৃৎ। আবার তাঁকে জাতির বিবেক বা কণ্ঠস্বরও বলা যেতে পারে।

১৯৩৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটে তাঁর জন্ম। পারিবারিক নাম আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। পিতা এ টি এম মোয়াজ্জেম ছিলেন বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক। মা সৈয়দা খাতুন গৃহিণী হলেও লেখালেখির অভ্যাস ছিল তাঁর। পিতামহ শেখ আবদুর রহিম ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে আনিসুজ্জামান ছিলেন চতুর্থ। অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতার পার্ক সার্কাস হাইস্কুলে আনিসুজ্জামানের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এখানে তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বাবা-মায়ের সঙ্গে খুলনায় এসে খুলনা জিলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এর এক বছর পর পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন এবং প্রিয়নাথ হাইস্কুলে ভর্তি হন। স্কুলটি এখন নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিত। ১৯৫১ সালে এই বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন।

দেশজুড়ে তখন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলন শুরু হয়েছে। কলেজের ছাত্র আনিসুজ্জামান সেই আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯৫২ সালে ভাষা নিয়ে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বৈরশাসকের ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় জড়ো হয়। ছাত্রদের সেই সমাবেশে আনিসুজ্জামানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৯৫৩ সালে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ সম্পন্ন করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও ১৯৫৭ সালে একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সেসময় বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই জ্ঞানতাপসেরও সান্নিধ্য পেয়েছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে আনিসুজ্জামান বাংলা একাডেমির গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা ১৭৫৭-১৯১৮ বিষয়ে পিএইচডি শুরু করেন। এরপর ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস: ইয়ং বেঙ্গল ও সমকাল বিষয়ে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালে আনিসুজ্জামান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের রিডার হিসেবে যোগ দেন।

পড়াশুনার পাশাপাশি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আন্দোলনের সংগঠক হিসেবেও অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের অবদান রয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভারতে শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ শিক্ষক

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান

সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। পরে যুদ্ধকালীন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগ দেন তিনি।

১৯৭২ সালের দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তরাজ্য ও ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সেই দিনটির অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর *বিপুলা পৃথিবী* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন–

> ১০ তারিখে সূর্যোদয় হলো অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। ... ১০ জানুয়ারির মতো বড়ো সমাবেশ আমি কখনো দেখিনি। বঙ্গবন্ধুকে দেখলাম দূর থেকে। তিনি যেন এই ক মাসে খানিকটা কৃশ হয়েছেন, কিন্তু কণ্ঠের তেজ বিন্দুমাত্র কমেনি। বক্তৃতায় তিনি জানিয়ে দিলেন ভুট্টোকে: কোনো বন্ধন নয় আর পাকিস্তানের সঙ্গে; বাংলাদেশ স্বাধীন, এর রাষ্ট্রীয় নীতি– ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। (আনিসুজ্জামান, *বিপুলা পৃথিবী*)

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর কুদরাত-ই-খুদাকে প্রধান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। আনিসুজ্জামান সেই কমিশনের সদস্য হন। ১৯৭৪-৭৫ সালে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমি স্টাফ ফেলো হিসেবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে গবেষণা করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পে অংশ নেন। ১৯৮৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন এবং ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে আবার যুক্ত হন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কলকাতার মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং ফেলো হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নজরুল ইনস্টিটিউট ও বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

আনিসুজ্জামানের আত্মজীবনীর প্রথম দুই খণ্ড *কাল নিরবধি* ও *আমার একাত্তর*-এর পর তৃতীয় খণ্ড *বিপুলা পৃথিবী*। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ শেষে লেখক যখন দেশে ফিরছেন, রাস্তায় তখন ভাঙা রেলসেতু, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত বাঙ্কার। কিন্তু যুদ্ধজয়ই তো

শেষ কথা নয়। এরপরই শুরু হয় দেশ গড়ার কাজ। এই গ্রন্থটি ব্যক্তির জীবন ছাপিয়ে উপমহাদেশের সার্বিক ট্র্যাজেডির প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং লোকসংস্কৃতি গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'এই বই যেন দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, সমকাল সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ভাষ্য।'

শিক্ষা ও গবেষণায় নিবেদিত প্রাণ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান দেশ-বিদেশের অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এসব সম্মাননা ও পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে–

১৯৫৬: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক

১৯৫৮: স্ট্যানলি ম্যারন রচনা পুরস্কার

১৯৬৫: দাউদ পুরস্কার

১৯৭০: প্রবন্ধ-গবেষণায় অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার

১৯৮৫: শিক্ষায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক

১৯৯৪: ভারতের *আনন্দবাজার* পত্রিকা-র অশোককুমার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার

২০০৫: ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি লিট ডিগ্রি

২০১৪: শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারত সরকারের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ পদক

২০১৫: সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার

২০১৭: আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *বিপুলা পৃথিবী*-র জন্য ভারতের *আনন্দবাজার* পত্রিকা-র আনন্দ পুরস্কার

২০১৮: বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক

২০১৯: সার্ক কালচারাল সেন্টার থেকে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার

২০১৯: শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য খান বাহাদুর আহছানউল্লা স্বর্ণপদক

তাঁর গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৪), *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (১৯৬৯), *মুনীর চৌধুরী* (১৯৭৫), *স্বরূপের সন্ধানে* (১৯৭৬), *Social Aspects of Endogenous Intellectual Creativity* (1979), *Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Official Library and Records* (1981), *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি* (১৯৮৩), *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ* (১৯৮৩), *পুরোনো বাংলা গদ্য* (১৯৮৪), *মোতাহার হোসেন চৌধুরী* (১৯৮৮), *Creativity, Reality and Identity* (1993), *Cultural Pluralism* (1993), *Identity, Religion and Recent History* (1995)।

একক ও যৌথ সম্পাদনাতেও তাঁর বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে– *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ* (১৯৬৮), *Culture and Thought* (যৌথ, ১৯৮৩), *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী* ১-৪ খণ্ড (১৯৮২-১৯৮৬), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (যৌথ, ১৯৮৭), *অজিত গুহ স্মারকগ্রন্থ* (১৯৯০), *স্মৃতিপটে সিরাজুদ্দীন হোসেন* (১৯৯২), *শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারকগ্রন্থ* (১৯৯৩), *নজরুল রচনাবলী* ১-৪ খণ্ড (যৌথ, ১৯৯৩), *SAARC: A People's Perspective* (1993), *শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা* (১৯৯৫), *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচনাবলী* (১ ও ৩ খণ্ড, ১৯৯৪-১৯৯৫), *নারীর কথা* (১৯৯৪), *ফতোয়া* (১৯৯৭), *মধুদা* (১৯৯৭), *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী* (১ম খণ্ড, যৌথ ২০০১), *ওগুস্তে ওসাঁর বাংলা-ফরাসি শব্দসংগ্রহ* (২০০৩), *আইন-শব্দকোষ* (২০০৬)।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের এক সাক্ষাতকার গ্রহণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখেছেন–

> গবেষণা ও লেখালেখিতে তাঁর নিজের জবানিতে, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের শুরুটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশুনার সময় থেকেই। তিনি কতকগুলো এলাকা বেছে নিয়েছিলেন গবেষণার– এর প্রাধান্য ছিল বাঙালিসত্তার বিবর্তন ও বিকাশ, বিশেষ করে মুসলমান বাঙালিসত্তার। এই অবধারিতভাবেই গবেষণা সীমাবদ্ধ থাকেনি সাহিত্যে, তা ছড়িয়ে পড়েছে ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সমাজতত্ত্বের অঞ্চলে।... জীবনী লিখেছেন কয়েক গুণী মানুষের। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যাকে বলে মনুমেন্টাল কাজ করেছেন, এমন এক সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিষিদ্ধ নাম, অথচ বাঙালির জেগে ওঠার এক সঞ্জীবনী উৎস।

রবীন্দ্র গবেষণায় তাঁর অনন্য গ্রন্থ: রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৮)। অনুবাদকর্মেও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁর সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশ্বনাটকের অনুবাদে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। একইসঙ্গে মৌলিক সাহিত্য রচনা করেছেন এবং আত্মজীবনী লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের গদ্য নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে ড. আনিসুজ্জামান যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। সত্তরের দশকে পুরনো বাংলা নিয়ে কলকাতা এবং লন্ডনে কাজও করেছিলেন। তারপর ১৯৮৪ সালে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় অর্থাৎ পুরনো বাংলা গদ্য নিয়ে বাংলা একাডেমিতে দুটো বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেছিলেন, বাংলা গদ্য ১৯ শতকে নয়, ১৬ শতকেই বিকশিত হয়েছিল। তিনি ১৬, ১৭ এবং ১৮ শতকে বাংলা গদ্যের ধরন বা নমুনা তুলে ধরার কাজেও হাত দিয়েছিলেন।

২০১৮ সালের ১৯শে জুন বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনি শিল্পকলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা *যামিনী* এবং বাংলা মাসিকপত্র *কালি ও কলম*-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতিও ছিলেন। বিভিন্ন সময় বেশ কিছু স্মারক বক্তৃতাতেও অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের অনন্য অবদান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে– ভারতের এশিয়াটিক সোসাইটিতে (কলকাতা) ইন্দিরা গান্ধী স্মারক বক্তৃতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা, ভারতের নেতাজী ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান অ্যাফেয়ার্সে নেতাজী স্মারক বক্তৃতা, অনুষ্টুপের উদ্যোগে সমর সেন স্মারক বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ১৯৬১ সালে সিদ্দিকা ওহাবের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী সিদ্দিকা ওহাব, দুই কন্যা রুচিরা, শুচিতা এবং পুত্র আনন্দকে নিয়েই ছিল তাঁর পরিবার। ২০২০ সালের ১৪ই মে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে এই বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী মানুষটির জীবনাবসান ঘটে। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে বাবার কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন–

> আত্মভোলা নন তিনি, নন অচেতন সমাজের
> কল্যাণ কি অকল্যাণ বিষয়ে কখনো যতদূর
> জানি দৃষ্টি তার সদা মানবের প্রগতির দিকে
> প্রসারিত। কী প্রবীণ, কী নবীন সকলের বরেণ্য নিয়ত।
> এখনো সিদ্ধির পরে, খ্যাতির শিখরে পদার্পণ
> করেও সাধনা তার থামেনি, বরং মাঝে মাঝে
> এখনো গভীর রাতে ঘুমন্ত জীবনসঙ্গিনীর পাশে শুয়ে
> অথবা টেবিলে ঝুঁকে থিসিসের ভাবনায় কাটান প্রহর।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা

জীবন গড়ার কারিগর বাবা

শিহাব শুভ

বাবা– শুধু একটি সম্পর্কের নাম নয়, তিনি একজন অভিভাবক। তাঁর ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠে পুরো সংসার। তিনি যেন এক বিরাট ছায়াদানকারী বটবৃক্ষ। তার শক্ত হাতটি ধরেই ছোটো শিশু সন্তানটি পথ চলতে এবং বাহিরের জগৎকে চিনতে শেখে। হাঁটা শিখতে গিয়ে যখন রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় সন্তান, তখন বাবাই তাকে উঠে দাঁড়াতে শেখান। জীবনের প্রত্যেক পদে কখনো বন্ধু হয়ে, কখনো শিক্ষক হয়ে তিনি সন্তানের পাশে থাকেন। সংসার পরিচালনার কাজে তাকে বাহিরে বাহিরে কাটাতে হয় ঠিকই কিন্তু তার লক্ষ্য থাকে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়া। সংসারের সমস্ত অর্থনৈতিক চাহিদা ও সন্তানের এটা-ওটার বায়না তো আছেই– সবকিছুর দায়ভার ন্যস্ত থাকে বাবার কাঁধে।

বাবা হচ্ছেন ভরসা ও ছায়ার নাম। তিনি হচ্ছেন পরম নির্ভরতার প্রতীক। বাবার প্রতি সন্তানের সম্মান, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশের জন্য প্রতিবছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্বে পালিত হয় 'বাবা দিবস'। সে হিসেবে এ বছর বাবা দিবস ছিল ২১শে জুন। পৃথিবীর সব বাবার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশের ইচ্ছা থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে বাবা দিবস পালন করা শুরু হয়। বাবা দিবস ঘোষণার বিষয়টি প্রথম ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সনোরা স্মার্ট ডোড নামের এক তরুণীর মাথায় আসে। ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাবা দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণার বিল উত্থাপন করা হয়। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন দিনকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেন।

সন্তানের জন্য বাবার ভালোবাসা অসীম। সন্তানের জন্য একজন বাবা তার জীবনও বাজি রাখতে পারেন। এমনই স্বার্থহীন যার ভালোবাসা, সেই বাবাকে সন্তানের খুশির জন্য জীবনের অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। সন্তানদের সেটি স্মরণে রেখে সবসময়ই উচিত বাবার প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ সময়ের গতি কখনো থেমে থাকে না। কালের এমনই লীলা যে সন্তানও একদিন বাবা হয়ে ওঠে। তখন সে নিজে বাবা হওয়ার কী আনন্দ সেই অনুভূতির স্বাদ পায়। ধীরে ধীরে সে বাবা নামক সম্পর্কটির সাথে পরিচিত হতে থাকে এবং সন্তানের প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো আবদারের সাথে সে তার নিজের ছোটোবেলার সঙ্গে যোগ করার চেষ্টা করে। তখন চোখের কোণা থেকে এক ফোটা জল গাল গলিয়ে নিচে পড়ে যায়। তখন বাবার সঙ্গে কাটানো সেই ছেলেবেলার স্মৃতিগুলো মনে করে। যাদের বাবা আছেন তাদের উচিত তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করা। কারণ বাইরে শত ঝড়ঝঞ্ঝা হওয়া সত্ত্বেও বাবা কখনো এর আঘাত তার সন্তানের গায়ে লাগতে দেন না। আমাদের উচিত তাদের বৃদ্ধ বয়সে তাদের বন্ধু হওয়া। তারা যেভাবে শক্ত হাতে ছোটোবেলায় আমাদের কোমল হাতটি ধরে চলতে শিখিয়েছেন, পড়তে শিখিয়েছেন, মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচতে শিখিয়েছেন, আমাদের উচিত তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া। কারণ আমরা বর্তমানে যা কিছু হয়েছি তা তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে। পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করতে সবসময় বাবা সচেষ্ট থাকেন। পরিবার তথা সমাজে একজন পিতার যে গুরুত্ব তা বোঝাতেই মূলত বাবা দিবস বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে থাকে। কারণ বাবা-মায়ের আসল স্থান তাদের পরিবারে, সন্তানের মাঝে। আর সংসারে বাবা হচ্ছেন বটবৃক্ষের মতন। সূর্যের তাপে নিজে পুড়ে সন্তানকে শীতল ছায়ায় বড়ো করে তোলেন। বাবার তুলনা বাবা নিজেই। তার কোনো তুলনা হয় না। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠার ফলে সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের সম্পর্ক তেমন শক্ত ভীতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। যার ফলে একক পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে। সন্তানেরা বাবা-মাকে একা ফেলে নতুন সংসার গঠনে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে তাদের

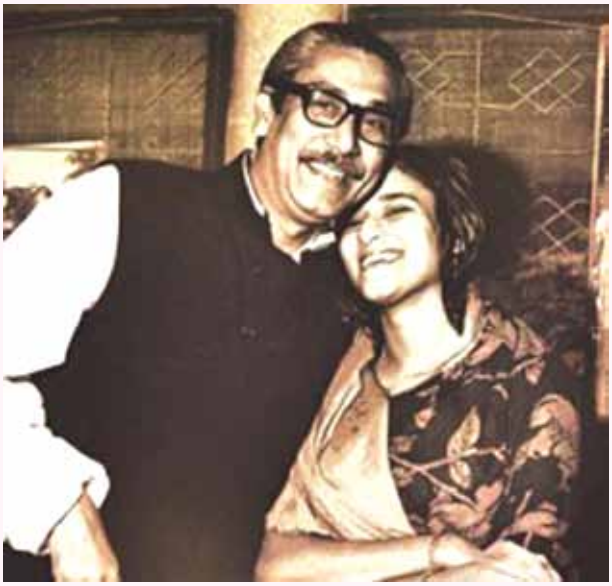

পিতার একান্ত স্নেহে শেখ হাসিনা

স্থান হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। কিন্তু এটা বর্তমান সমাজের বড়ো একটা অবক্ষয়। আর এর থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমানে বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক যাতে আরো দৃঢ় হয় সেজন্য বর্তমান সরকার বাবা-মা'র ভরণপোষণের জন্য ২০১৩ সালে আইন পাস করেছে।

এ আইনের ৩ ধারায় যা উল্লেখ করা হয়েছে– ১. প্রত্যেক সন্তানকে তার পিতা-মাতার ভরণপোষণ নিশ্চিত করিতে হইবে, ২. কোন পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকিলে সেই ক্ষেত্রে সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদের পিতা-মাতার ভরণপোষণ নিশ্চিত করিবে, ৩. এই ধারার অধীনে পিতা-মাতার ভরণপোষণ নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে পিতা-মাতার একইসঙ্গে একই স্থানে বসবাস নিশ্চিত করিতে হইবে, ৪. কোন কোন সন্তান তার পিতা-মাতাকে বা উভয়কে তাহার বা ক্ষেত্র মতে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বৃদ্ধ নিবাস কিংবা অন্য কোথাও এক্ষেত্রে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করিতে বাধ্য করিবে না, ৫. প্রত্যেক সন্তান তাহার পিতা-মাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখিবে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করিবে, ৬. পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে সন্তান হইতে পৃথকভাবে বসবাস করিলে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে নিয়মিতভাবে তাহার বা ক্ষেত্রমত তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, ৭. কোন পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে সন্তানদের সহিত বসবাস না করিয়া পৃথকভাবে বসবাস করিলে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পিতা বা মাতার প্রত্যেক সন্তান তাহার দৈনন্দিন আয়-রোজগার বা ক্ষেত্রমত মাসিক আয়, বাৎসরিক আয় হইতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা বা মাতা বা ক্ষেত্র মত উভয়কে নিয়মিত প্রদান করিবে।

পিতামাতাকে ভরণ-পোষণ প্রদান না করিলে জেল-জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে– ১. কোন সন্তান কর্তৃক এ আইনের বিধান লংঘন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ, অনাদায়ে অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, ২. কোনো সন্তানের স্ত্রী বা ক্ষেত্রমত স্বামী কিংবা পুত্র-কন্যা বা অন্য কোনো নিকট আত্মীয় ভরণপোষণে বাধা প্রদান করিলে বা অসহযোগিতা করিলে তিনি উপরে উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, ৩. কোনো বৃদ্ধ বাবা-মা কিংবা উভয়কে সন্তানেরা যদি ভরণপোষণ না করে আইন অনুযায়ী সেবা-যত্ন ও দেখা সাক্ষাৎ না করে তাহলে চাইলেই তারা এ আইনের আশ্রয় নিতে পারেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

আধুনিক কবিতাচর্চায় নারী

ড. শিল্পী ভদ্র

'আধুনিক কবিতাচর্চায় নারীর অবদান' বিষয়ক প্রসঙ্গে প্রথমেই এসে যায় নারী শিক্ষার কথা। তবে নারী শিক্ষার প্রবর্তন খুব সহজে হয়নি। উনিশ শতকের নবজাগরণ, বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার, রামমোহন, ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের কঠোর পরিশ্রমে নারী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। শিক্ষিত হয়ে এদেশের নারীরা শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠে। আর বিশ শতকে নারী স্বাধীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে আমাদের বাংলা সাহিত্যে নারী কবির সংখ্যাও বেড়েছে।

'বাংলা কবিতাচর্চায় নারীর অবদান' প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে রামী বা রজকিনী রামীর নাম। বাংলা ভাষার এই প্রথম কবির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকে। চতুর্দশ শতকের কবি রামীকে পাওয়া গেলেও তাঁর ভাষারূপ পাওয়া যায়নি। পঞ্চদশ শতকের কবি মাধবী দাসী সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সন্দেহাতীতভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি ষোড়শ শতকের সূচনাপর্বের চন্দ্রাবতী (আনুমানিক ১৫৫০-১৬০০)।

সপ্তদশ শতক বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যাযুগ। সুদূর আরাকানে বসে কিছু বাঙালি কবির কাব্যসাধনা এই শতকের মূল সম্পদ। শ্রীচৈতন্য প্রভাবে বৈষ্ণবপদ রচনার একটা ক্ষীণধারা মূল বঙ্গদেশে তখনো প্রবাহিত। এই পর্বের শ্যামপ্রিয়া এমনই এক বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি; আঠারো শতকের আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি দেবীও তাই।

বাংলা সাহিত্যে কবিতাচর্চায় নারীদের ঢল নামে উনিশ শতকের রোমান্টিক কবিতা রচনা পর্বে। উনিশ শতকের সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা যদি শুধু কবিদেরও বেছে নিই, সে তালিকাও দীর্ঘ হবে। সাধারণভাবে পরিচিত আছে এমন কবিদের নাম ও কাব্য তালিকা প্রদান করা হলো–

১. অবলা সেন– ফরিদপুরের কন্যা। আবির্ভাব শতক ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না, ২. স্বর্ণকুমারী দেবী– *গাথা* (১৮৮০), *কবিতা ও গান* (১৮৮৫), ৩. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী– *কবিতাহার* (১৮৭৩), *ভারত কুসুম* (১৮৮২), *অশ্রুকণা* (১৮৮৭), *আভাষ* (১৮৯০), *শিখা* (১৮৯৬), *অর্ঘ্য* (১৯০২) ইত্যাদি, ৪. অনঙ্গমোহিনী দাসী – ১৮৫৮ সালে ঈশ্বরগুপ্ত *সংবাদ প্রভাকরের* পাতায় তাঁর কবিতা ছাপেন, ৫. মানকুমারী দেবী– *বীরকুমার বধ*, *কাব্যকুসুমাঞ্জলি* ইত্যাদি (১৮৬৩), ৬. কামিনী রায়– *আলো ও ছায়া*, *পৌরাণিকী*, *শ্রাদ্ধিকী*, (১৮৬৪), ৭. বিরাজ মোহিনী দাসী– *কবিতাহার* (১৮৭৬), ৮. ভুবন মোহিনী দেবী– *স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান* (১৮৭৮), ৯. নবীন কালী দেবী– *শ্মশানভ্রমণ কাব্য* (১৮৭৯), *ষাটচক্রভেদ* (১৮৮৬), ১০. নিস্তারিনী দেবী– *কেশবজ্যোতি* (১৮৮৫), *মনোজবা* (১৯০৪), *রেণুকণা* (১৯০৭), *আকাশবাণী* (১৯৩১), ১১. ষোড়শীবালা দাসী– *পুষ্পকুঁড়ি* (১৮৮৫), ১২. প্রসন্নময়ী দেবী– *নীহারিকা কাব্যগ্রন্থ* (১৮৮৭), ১৩. ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী– *কবিতামালা* (১৮৮৮), ১৪. প্রমীলা নাগ– *প্রমীলা কাব্য* (১৮৯০), *তটিনী কাব্য* (১৮৯০), ১৫. বিনয়কুমারী বসু– *নির্ঝর* (১৮৯২), ১৬. মনোমোহিনী গুহ– *চারুগাথা* (১৮৯৩), ১৭. রানী মৃনালিনী- *নির্ঝরিণী* (১৮৯৫), *মনোবীণা* (১৯০০), ১৮. সরোজ কুমারী গুপ্তা– *হাসি ও অশ্রু* (১৮৯৩), *অশোকা কাব্য* (১৯০১), ১৯. কুসুমকুমারী দাস– *কবিতা মুকুল* (১৮৯৬), ২০. নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী– *প্রেমগাথা* (১৮৯৮), *অমিয়গাথা* (১৯০১), *ব্রজগাথা* (১৯০২), ২১. কুসুমকুমারী দেবী– *প্রসুনাঞ্জলী* (১৯০০), ২২. অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা– *প্রীতি ও পূজা* (১৮৯৭), ২৩. তিলোত্তমা দাসী– *আক্ষেপ* (১৯১৩), ২৪. চরুহাসিনী দেবী– *অন্ত্যঞ্জলি* (১৯১৪), ২৫. সুনীতি দেবী– *সাহানা* (১৯১৫), ২৬. হেমন্তবালা দত্ত– *মাধবী* (১৯১৫), ২৭. প্রফুল্লময়ী দেবী– *পুষ্পরাগ* (১৯২৩), ২৮. সুবালা দেবী– *ভাবপুষ্প* (১৯২৪), ২৯. কনকলতা ঘোষ– *রেখাকাব্য* (১৯২৯), ৩০. চারুলতা দেবী– *ব্যথিতার গান* (১৯৩০), ৩১. সুরবালা ঘোষ– *মধুরা* (১৯৩০), ৩২. রাধারানী দেবী– *প্রেমের পূজা* (১৯২৯), ৩৩. ভক্তিসুধা দেবী– *রজনীগন্ধা* (১৯৩১), ৩৪. প্রিয়ম্বদা দেবী– *চম্পা ও পাটল* (১৯৩১), ৩৫. উমা দেবী– *বাতায়ন*, ৩৬. মৈত্রেয়ী দেবী– *উদিতা* (১৯৩০), ৩৭. জগত্তারিনী দেবী– *কবিতামালা* (১৯৩৮), ৩৮. সুরজবালা দেবী– *সুরজ গাথা* (১৯৩৮), ৩৯. অন্নপূর্ণা দেবী– *হৃদিউচ্ছ্বাস* (১৯৪২), ৪০. আভা দেবী– *অর্চ্চনা* (১৯৪৩), ৪১. স্নেহলতা দেবী– *অঞ্জলি* (১৯৪৩)।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে (১৮০০-বর্তমান সময়) নারীদের লেখায় (রচিত কবিতায়) তাদের অবদান জানতে এবং এই সময়ের যুগচরিত্র ও ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক ধারণা পেতে এই সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট কবিকে প্রতিনিধিরূপে বেছে নেব। আমাদের অভিপ্রায় এই কবিদের কবিতাসমূহে নতুনরূপে প্রতিফলিত বিষয় নিরূপণ করা এবং তাতে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য খুঁজে বের করা–

চন্দ্রাবতী (আনুমানিক ১৫৫০-১৬০০)**/ রজকিনী রামী**

চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহ নিবাসী মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দ্বিজ বংশীদাসের মেয়ে। পিতাই তাঁর শিক্ষক। তরুণ বয়সেই তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফুরণ ঘটে। পিতার প্রেরণায় অল্প বয়সে মনসার গান লিখেন। বাংলা ভাষায় রামায়ণের ভাবানুবাদ করেছেন চন্দ্রাবতী। অথচ এই কবি ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণায় নিজেকে নিঃশেষ করেন। চন্দ্রাবতীরও আগে জন্ম নিয়েছেন কবি রামী। যদিও তাঁর বিষয়ে সব পণ্ডিত একমত নন। তাঁর কিছু কবিতা, ভণিতা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। রামীর আগেও দু-একজন মহিলা কবির ভণিতা পাওয়া যায় তবে সেগুলো তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নয়।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪- ১৯০৩)

তিনি ১৮৩৪ সালে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিমগাঁতে জন্মগ্রহণ করেন। মুহম্মদ গাজী চৌধুরীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ফয়জুন্নেসার দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়নি এবং পরিশেষে তাঁদের বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে। নানা ব্যাধি ও অন্তর্জীবনের অশান্তিই তাঁর সাহিত্য সাধনার অন্যতম কারণ। ফয়জুন্নেসার সাহিত্য কীর্তি *রূপজালাল*। তাঁর এ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। তাঁর *সঙ্গীত লহরী* ও *সঙ্গীত সার* গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হলেও তা এখন দুষ্প্রাপ্য।

স্বর্ণকুমারী দেবী (২৮শে আগস্ট ১৮৫৫- ৩রা জুলাই ১৯৩২)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য নারী সাহিত্যিক হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম পরিচিত। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫ সালের ২৮শে আগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতনি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ মেয়ে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম *গাথা* (১৮৮০), *কবিতা ও গান* (১৮৮৫)।

কামিনী রায় (১২ই অক্টোবর ১৮৬৪-২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)

১৮৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে এক বৈদ্য পরিবারে কামিনী রায়ের জন্ম হয়। আট বছর বয়স থেকেই কবিতা লিখেন। তাঁর পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৬ সালে কামিনী রায় বেথুন ফিমেল স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সালে স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং ১৯০৯ সালে বৈধব্য ঘটে। তাঁর *আলো ও ছায়া* কাব্যখানি সাহিত্যসমাজে তাঁকে স্থায়ী আসন দান করেছিল।

বেগম রোকেয়া (৯ই ডিসেম্বর ১৮৮০- ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩২)

১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। রক্ষণশীল পরিবারে

জন্মগ্রহণ করেও নিজের চেষ্টা ও মনোবল দিয়ে তিনি ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সম্ভ্রান্ত ঘরে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামীর সহযোগিতায় তিনি লেখাপড়া করার ও চিত্তবিকাশের সুযোগ পান। কিন্তু বিয়ের মাত্র দশ বছর পরে স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু হলে তিনি সমাজসংস্কার ও গঠনমূলক কাজে নিজেকে উজাড় করে দেন। বেগম রোকেয়া রচিত গ্রন্থ তাঁর চিন্তা ও কর্মাদর্শের বাণীরূপ। *মতিচূর*, *পদ্মরাগ*, *অবরোধবাসিনী*, *সুলতানার স্বপ্ন* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৬ই ডিসেম্বর ১৯০৬- ২রা মে ১৯৭৭)

তিনি ১৯০৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাবনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা খান বাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মান সিদ্দিক। দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন। মাত্র নয় বছর বয়সে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *আল ইসলাম* পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ত্রিশ বছর ধরে তাঁর কবিতা সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পসারিণী* ১৯৩৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় মুসলিম মহিলা কবির এটাই প্রথম প্রকাশিত আধুনিক কবিতার বই।

শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮- ১০ই এপ্রিল ১৯৬৪)

তিনি ১৯০৮ সালে নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি তিন বিষয়ে ডিস্টিংশন নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩২ সালে বিএ এবং ১৯৪২ সালে এমএ পাস করেন। তিনিই বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত তৎকালীন কিশোরপত্র *আঙ্কুর*-এ তাঁর প্রথম রচনা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। তিনি রচনা করেছেন *রাকেয়া জীবনী*, *বেগম মহল*, *শিশুর শিক্ষা*, *আমার দেখা তুরস্ক*। তাঁর সর্বশেষ রচনা *নজরুলকে যেমন দেখেছি*। শামসুর নাহার মাহমুদ ১৯৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

বেগম সুফিয়া কামাল (২০শে জুন ১৯১১-২০শে নভেম্বর, ১৯৯৯)

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি ১৯১১ সালে বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ পরগণায় মাতামহ সৈয়দ মুয়াজ্জম হোসেন চৌধুরীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সুফিয়া কামাল স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি। এগারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সুযোগ পান। সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি সুফিয়া কামাল সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'বাসন্তী'– সে সময়ের প্রভাবশালী সাময়িকী *সওগাত*-এ প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি গল্প, ভ্রমণ কাহিনি, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথাও লিখেছেন। এই নন্দিত কবি ঢাকায় ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সেলিনা হোসেন (১৪ই জুন ১৯৪৭-)

১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন রাজশাহী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একইসঙ্গে কথাসাহিত্যিক, গবেষক এবং প্রাবন্ধিক। জীবনের গভীর উপলব্ধির প্রকাশকে তিনি শুধু কথাসাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, শাণিত ও শক্তিশালী গদ্যের নির্মাণে প্রবন্ধের আকারেও উপস্থাপন করেছেন। বেশ কয়েকটি উপন্যাসে তিনি বাংলার লোক-পুরাণের উজ্জ্বল চরিত্রগুলোকে নতুনভাবে এনেছেন। ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বিশ বছরেরও বেশি সময় *ধান শালিকের দেশ* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা পরিচালক হন।

উনিশ শতকে নবজাগরণের যে কটি নতুন ধারণা ছিল, যথা– আর্তের সেবা, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, প্রকৃতিকে নতুন চোখে দেখা, স্বদেশ ও সমাজপ্রীতি, পুরোনো সংস্কারকে নতুন যুক্তিবোধ দিয়ে যাচিয়ে নেওয়া– এসব বৈশিষ্ট্য বা ধারণা আলোচ্য কবিগোষ্ঠীর লেখায় ফিরে ফিরে এসেছে। আরো যেকটি বৈশিষ্ট্য এদের লেখায় বারবার এসেছে তাহলো– স্বামী নামক ব্যক্তিকে গতানুগতিক সংস্কারের চোখে না দেখে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে দাম্পত্য রোমান্স এবং কোথাও কোথাও সকৃতজ্ঞ আনুগত্য গড়ে তোলা, নারী হিসেবে নারীমুক্তির সওয়াল করা এবং শিশুর প্রতি বাৎসল্য ভাব।

আধুনিক যুগে নারীরা নিজেদের জানতে-চিনতে পেরেছে। তারা আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ, মানবীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রভৃতি উপলব্ধি করতে পারায়, এর সবই চিত্রায়িত হয়েছে তাঁদের রচিত কবিতায়। তাই লেখনীতে উঠে এসেছে জীবনের নানা বিচিত্র বিষয়।

রোমান্টিক কবিতার লক্ষণ, বিষণ্ন-বিধুরতা, ভাববিহ্বলতা, প্রকৃতির শোভা বর্ণনা, আশা ও আনন্দের সুর, আত্মজিজ্ঞাসা, প্রেমের

অনুভূতিতে অতৃপ্তি এবং সংশয়, দাম্পত্য বহির্ভূত সম্পর্ক, নিঃসঙ্গ হয়েও একা চলার মনোবল, আশাহত হয়েও সত্যাশ্রয়ে উঠে দাঁড়ানো, মানব জীবনের বিভিন্ন জটিলতা, রোমান্টিক গীতি কবিতার তরলিত বেগ বা অতিপেলবতার উচ্ছ্বাস, সামাজিক বিরুদ্ধতার যন্ত্রণা, আধুনিক যুগের বাধা, শিক্ষিত নারীর অন্তঃজ্বালা, আবেগ-আকুতির জীবন্ত তাপের সঞ্চালন, অধুনা নারীর আবেগের বিস্ময়কর-বিচিত্র জগৎ, শোককে শক্তিতে পরিণত করা, নারী জাগরণ, পরাধীন নারী,নারীর প্রতি পদে অনুশাসন, সংস্কারমুক্ত যুক্তিচিন্তা, ভাবনার প্রগতিশীলতা, নারী শিক্ষার গুরুত্ব, বিদ্যা-বুদ্ধি-দয়া প্রভৃতি মানবিক গুণ জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনবোধ, পুরনো প্রথা ও অসঙ্গতিকে যুক্তি-মানবিক অনুভূতি দিয়ে আহ্বান করা, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, গৃহকোণ থেকে বের হয়ে বৃহতের সঙ্গে পরিচয় ও স্বনির্ভরতা, প্রগতিশীল মনোভাব, কখনো কখনো মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সীমাবদ্ধতা, নারীর প্রকৃত মঙ্গলের ধারণা ও দ্বিধাগ্রস্ততা, জীবনের গতিবেগ পরিবর্তনের মোড়, প্রত্যক্ষ আবেগের তাপ, অন্তর্মুখিতা, আত্মকথন, ফাঁপা আবেগ, কৃত্রিম সহানুভূতি বাদ দিয়ে হৃদয়বৃত্তির প্রকৃত প্রকাশ, সামাজিক আন্দোলনে বাস্তব প্রেরণা, দেশপ্রেম, সৌন্দর্যচেতনা, শারীরিক বিরহ, বিষাদবোধ, অনির্দেশ যাত্রা, দেশ ও দশের মঙ্গলসাধনার ব্রতমূলক কর্মোদ্দীপনা, স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেমের বিষয়, হৃদয়ের ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখ, স্মৃতি নিয়ে বসবাস না করে বাস্তবতার স্বীকারোক্তি, মানব জীবনের অভাববোধ, জীবনের চাওয়াকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ, হৃদয়-জাগরিত তৃষ্ণার প্রকাশ, নির্ভীক চিত্ত, জ্ঞানের স্বাবলম্বন, দার্শনিক চিন্তা, আত্মমর্যাদায় প্রাণবন্ত নারী প্রভৃতি নানান বিষয়ের সমাবেশ ও খোলামেলা বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে নারীর আধুনিক কবিতাচর্চায়।

এই নব নব সৃষ্টিশীলতার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নারী আজ পেয়েছে বিশ্বখ্যাতি। জীবনের নানাক্ষেত্রের মতো সাহিত্যক্ষেত্রে তথা আধুনিক কবিতাচর্চায় নারীর অবদান উত্তরোত্তর ব্যাপকভাবে বেড়েই চলছে। সাহিত্যে সেদিন অবশ্যই আসবে যেদিন 'মহিলা কবি' কথাটির বিলুপ্তি ঘটবে। তখন সাহিত্য হবে সর্বজনীন। যেদিন কোনো লেখককে লিখতে হবে না 'বাংলা সাহিত্যে নারীর অবদান' বরং লিখবে 'বিশ্বসাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের অবদান ও অবস্থান'।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও ফেলোশিপ গবেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বসেরা তালিকায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বসেরা দুই হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ১ হাজার ৭৯৪তম হয়েছে। বাংলাদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এই তালিকায় স্থান পায়নি। যদিও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ৬৪টি ও পাকিস্তানের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় এ তালিকায় স্থান পেয়েছে। এ তালিকাটি সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক সংস্থা সেন্টার ফর ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং (সিডব্লিইউইউআর) প্রকাশ করে। ৮ই জুন সংস্থাটির নিজেদের ওয়েবসাইটে 'ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২০-২১' শীর্ষক এ তালিকা প্রকাশ করেছে সিডব্লিউইউআর।

এ সংস্থাটি ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই র‍্যাংকিং প্রকাশ করে আসছে। মোট ৭টি সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক মান যাচাই করে থাকে সিডব্লিউইউআর। এগুলো হলো– শিক্ষার মান, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পেশাগত অবস্থান, শিক্ষকদের মান, গবেষণার সংখ্যা, উচ্চমানসম্পন্ন প্রকাশনা, গবেষণা প্রস্তাব ও গবেষণা উদ্ধৃতি। এ সাত সূচকের মোট স্কোর ১০০-র মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোর ৬৬ দশমিক ৬। আর ১০০ তে ১০০ স্কোর অর্জন করে এ র‍্যাংকিংয়ে টানা নবমবারের মতো বিশ্বের এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অর্জন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

সিডব্লিউইউআরের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যানুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং নির্ধারণের সূচকগুলোর মধ্যে শিক্ষার মান ও সাবেক শিক্ষার্থীদের পেশাগত অবস্থানের স্কোর প্রতিটিতে ২৫ করে মোট ৫০। বাকি ৫টি সূচকের প্রতিটির স্কোর ১০ করে মোট ৫০। শিক্ষার মান সূচকে দেখা হয়– বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর অনুযায়ী কত সংখ্যক প্রাক্তন শিক্ষার্থীর বড়ো ধরনের একাডেমিক অর্জন রয়েছে, সাবেক শিক্ষার্থীদের পেশাগত অবস্থান দেখা হয়, কলেবর অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতসংখ্যক প্রাক্তন শিক্ষার্থী বিশ্বের বৃহৎ কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন শীর্ষ নির্বাহী পদে রয়েছেন। আর শিক্ষকদের মানের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের একাডেমিক অর্জনধারী শিক্ষকের সংখ্যা দেখা হয়।

গবেষণার সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক গবেষণাপত্রের সংখ্যা, উচ্চমানসম্পন্ন প্রকাশনায় বিশ্বের প্রথম সারির জার্নালগুলোতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা, গবেষণা-প্রভাবে বিভিন্ন প্রভাবশালী জার্নালে শিক্ষকদের প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা এবং গবেষণা-উদ্ধৃতিতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত গবেষণাপত্রের সংখ্যা দেখা হয়।

প্রতিবেদন: খালিদ হোসেন

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে সুফিয়া কামাল

জাহানারা বেগম

বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা কবি, লেখিকা, নারীবাদী ও আধুনিক বাংলাদেশের নারী প্রগতি আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল বারী পেশায় একজন উকিল ছিলেন। তাঁর মাতার নাম সৈয়দা সাবেরা খাতুন। যে সময়ে সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বাঙালি মুসলিম নারীরা গৃহবন্দি হয়ে জীবন কাটাতেন। স্কুল কিংবা কলেজে পড়ার কোনো সুযোগই তারা পেতেন না। পরিবারগুলোতে বাংলা ভাষার ব্যবহার একরকম নিষিদ্ধ ছিল। সেই অবরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো সুযোগ পাননি। তিনি পারিবারিক নানা উত্থান-পতনের মধ্যে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। সুফিয়া কামালের বয়স যখন সাত তখন তাঁর পিতা সাধকদের অনুসরণে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। এই কারণেই সুফিয়া কামালের শৈশব নানাবাড়িতেই কেটেছিল। নিরুদ্দেশ পিতার অনুপস্থিতিতে তিনি মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের স্নেহ-পরিচর্যায় লালিতপালিত হন।

যে সময়ে মুসলিম মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষায় ছিল একেবারেই পশ্চাৎপদ, সে সময়ে সুফিয়া কামালের মতো স্বশিক্ষিত ও সমাজপ্রগতি সচেতন নারীর আবির্ভাব ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার। শায়েস্তাবাদে নানাবাড়ির রক্ষণশীল অভিজাত পরিবেশে বড়ো হলেও সুফিয়া কামালের মনোগঠনে দেশ, দেশের মানুষ, সমাজ এবং ভাষা ও সংস্কৃতি মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তিনি যদিও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেননি তারপরও তখনকার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সত্ত্বেও তিনি নিজ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে হয়ে ওঠেন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত। নানাবাড়িতে উর্দু ভাষার চল থাকলেও নিজ উদ্যোগে তিনি বাংলা ভাষা শিখে নেন।

১৯১৮ সালে সুফিয়া কামাল তাঁর মায়ের সঙ্গে কলকাতা যান। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। কিছুদিন পরে তিনি শায়েস্তাবাদ ফিরে আসেন বটে, কিন্তু তাঁর শিশুমনে রোকেয়া-দর্শনের সেই স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকে; বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিত্ব তাঁকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করতে থাকে।

১৯২৩ সালে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে সুফিয়া কামালের বিয়ে হয়। পরে তিনি 'সুফিয়া এন হোসেন' নামে পরিচিত হন। সৈয়দ নেহাল হোসেন সুফিয়া কামালকে সমাজসেবা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেন। সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে সুফিয়ার যোগাযোগও ঘটিয়ে দেন তিনি। এর ফলে সুফিয়া কামাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ' যা বরিশালের *তরুণ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯২৫ সালে বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎ হয়। এর পূর্বে গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কিছুদিন চরকায় সুতা কাটেন। তিনি এ সময় নারী কল্যাণমূলক সংগঠন 'মাতৃমঙ্গল'-এ যোগ দেন।

বেগম সুফিয়া তাঁর স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় গেলে সেখানে বিশেষ বিশেষ বাঙালি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের একজন হলো কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি সুফিয়া কামালের কবিতা

পড়ে মুগ্ধ হন এবং সেগুলো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' প্রকাশ করেন।

১৯২৯ সালে সুফিয়া কামাল বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত মুসলিম মহিলা সংগঠন 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম'-এ যোগ দেন। এই সংগঠনে নারী শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারসহ নারীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। বেগম রোকেয়ার সামাজিক আদর্শ সুফিয়াকে আজীবন প্রভাবিত করেছে। তিনি বেগম রোকেয়ার ওপর অনেক কবিতা রচনা করেন এবং তাঁর নামে *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৯৭০) শীর্ষক একটি সংকলন উৎসর্গ করেন। তিনি 'রোকেয়া সাখাওয়াত স্মৃতি কমিটি' গঠনে সহায়তা করেন, যার প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা হল 'রোকেয়া' নামে করা হয়।

১৯৩১ সালে সুফিয়া কামাল মুসলিম মহিলাদের মধ্যে প্রথম 'ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালে তাঁর স্বামী মারা যান। ১৯৩৩-১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা করপোরেশন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এই স্কুলেই তাঁর পরিচয় হয় প্রাবন্ধিক আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) এবং কবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) এর সঙ্গে।

স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি সুফিয়া কামালের সাহিত্যচর্চাও চলতে থাকে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থটি যার ভূমিকা লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থটি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এর মাধ্যমেই সুফিয়ার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পরের বছর আপনজন ও শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছায় তিনি চট্টগ্রামের লেখক ও অনুবাদক কামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে পুনরায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সেই থেকেই তিনি সুফিয়া কামাল নামে পরিচিত হন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় যখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধে, তখন দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্যার্থে সুফিয়া কামাল সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি লেডি ব্র্যাবোন কলেজে একটি আশ্রয়কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে সাহায্য করেন। পরের বছর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকা প্রকাশ করলে

তিনি তার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ বছরের অক্টোবর মাসে তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন।

১৯৪৮ সালে সুফিয়া কামাল ব্যাপকভাবে সমাজসেবা ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। এবছরই তাঁকে সভানেত্রী করে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সুলতানা* পত্রিকা যার নামকরণ করা হয় বেগম রোকেয়ার *সুলতানার স্বপ্ন* গ্রন্থের প্রধান চরিত্রের নামানুসারে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সুফিয়া কামাল সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর দমন নীতির অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি তার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তিনি 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন' পরিচালনা করেন। ১৯৬৯ সালে 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' (বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) গঠিত হলে তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাচিত হন এবং আজীবন তিনি এর সঙ্গে জড়িত থাকেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। ভারতের আগরতলায় তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের সেবার জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। সুফিয়া কামাল, তাঁর স্বামী ও ছেলে দেশের মধ্যেই থেকে যান মুক্তিবাহিনীকে সাহস ও শক্তি জোগানোর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন খবরাখবর সরবরাহের জন্য। যুদ্ধকালীন তিনি *একাত্তরের ডায়েরি* নামে একটি দিনলিপি রচনা করেন এবং এ সময়ে তাঁর লেখা কবিতাগুলো পরবর্তীকালে *মোর জাদুদের সমাধি পরে* নামে এবং পরে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলোতে তিনি বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা বর্ণনা করেন। সে সময়কালে তাঁর লেখনী স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে। এ সময় তাঁর রচিত 'বেনীবিন্যাস সময় তো আর নেই' কবিতায় মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মহিলাদেরও আহ্বান জানান।

স্বাধীনতার পরেও সুফিয়া কামাল অনেক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। তিনি যেসব সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন সেগুলো হলো– বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন কমিটি এবং দুস্থ পুনর্বাসন সংস্থা। এছাড়াও তিনি ছায়ানট, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এবং নারী কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী ছিলেন।

সুফিয়া কামাল *একালে আমাদের কাল* নামে একটি আত্মজীবনী রচনা করেছেন। তাতে তাঁর ছোটোবেলার কথা এবং রোকেয়া প্রসঙ্গ স্থান পায়। তিনি অনেক ছোটোগল্প এবং ক্ষুদ্র উপন্যাসও রচনা করেছেন। *কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭) তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। তাঁর আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪), *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯) ইত্যাদি। তাঁর কবিতা চীনা, ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান, পোলিশ, রুশ, ভিয়েতনামিজ, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে রুশ ভাষায় তাঁর *সাঁঝের মায়া* গ্রন্থটি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে বাংলা একাডেমি তাঁর কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে *Mother of Pearls and Others Poems* এবং ২০০২ সালে সুফিয়া কামালের *রচনাসমগ্র* প্রকাশ করেছে।

সুফিয়া কামালের কবিতার বিষয় প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত অনুভূতি, বেদনা স্মৃতি, জাতীয় উৎসবাদি, স্বদেশানুরা, মুক্তিযুদ্ধ এবং ধর্মানুভূতি। অন্তরঙ্গ আবেশের বিশিষ্ট পরিচর্যায় এবং ভাষাভঙ্গির সহজ আবেদনঘন স্পর্শে তাঁর কবিতা সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তিনি ভ্রমণ ও ডায়েরি জাতীয় গদ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টিরও বেশি।

কাব্যগ্রন্থ: *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮), *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* (১৯৫৮), *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪), *দিওয়ান* (১৯৬৬), *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯), *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৯৭০), *মোর জাদুদের সমাধি পরে* (১৯৭২)

গল্প: *কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭)

ভ্রমণকাহিনি: *সোভিয়েতে দিনগুলি* (১৯৬৮)

স্মৃতিকথা: *একাত্তরের ডায়েরি* (১৯৮৯)

আত্মজীবনীমূলক রচনা: *একালে আমাদের কাল* (১৯৮৮)

শিশুতোষ: *ইতল বিতল* (১৯৬৫), *নওল কিশোরের দরবারে* (১৯৮১)

অনুবাদ: *সাঁঝের মায়া– বলশেভনী সুমেকী (রুশ)* ১৯৮৪।

পুরস্কার: সুফিয়া কামাল ৫০টির বেশি পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– পাকিস্তান সরকারের তমঘা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬১) (প্রত্যাখান করেন ১৯৬৯), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), সোভিয়েত লেনিল পদক (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), সংগ্রামী নারী পুরস্কার, চেকোস্লোভাকিয়া (১৯৮১), মুক্তধারা পুরস্কার (১৯৮২), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৫), দেশবন্ধু সি আর দাস গোল্ড মেডেল (১৯৯৬) ও স্বাধীনতা দিবস পদক (১৯৯৭)।

১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর সুফিয়া কামাল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। প্রতিবছর এই দিনটিতে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করা হয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক

জামালপুরে পিসিআর ল্যাবের উদ্‌বোধন

জামালপুরে সহজে ও দ্রুত করোনা শনাক্তের জন্য আরটি পিসিআর ল্যাবরেটরি উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ১২ই মে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান এ ল্যাবরেটরি উদ্‌বোধন করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। তাই একসঙ্গে অনেক মানুষের নমুনা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ফলে জেলাবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জামালপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মির্জা আজম ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসানের চেষ্টায় এই ল্যাব স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, এই ল্যাবে প্রতি ছয় ঘণ্টায় ৯৪টি নমুনা পরীক্ষা করা যাবে। এ ল্যাবে ৬ জন চিকিৎসক ও ৬ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাজ করবেন। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অনেকে কাজ করবেন। এগুলোর ফলাফল জেলার সিভিল সার্জন ও সরকারের আইইডিসিআরসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হবে।

প্রতিবেদন: সায়েদা খাতুন

ধলেশ্বরী আমার জলেশ্বরী

মিয়াজান কবীর

ধলেশ্বরী উথালপাথাল ঢেউ দোলানো নদী,
আঁকাবাঁকা পথটি ধরে বহে নিরবধি।
ভাটির টানে কুলুকুলু সাগর পানে চলে,
ঢেউয়ের তালে মল বাজে তার ছলোছলো জলে।
জলকে চলে পল্লিবালা কলসি নিয়ে কাঁখে,
পালতোলা নাও ভেসে চলে উজানভাটির বাঁকে।
ভেসাল জালে মাছ যে ধরে গাঁয়ের কানাই জেলে,
রাখাল ছেলে যায় পাথারে লগি ঠেলে ঠেলে।
নাইয়রি যায় বাপের বাড়ি ছইয়া নায়ে চড়ে,
মাঝিমাল্লা বৈঠা টানে ছলাৎ ছলাৎ করে।
দুষ্টু ছেলে সাঁতার কাটে ঢেউয়ের দোলায় দোলে,
অইলডুব খেলায় মেতে ওঠে কাজের কথা ভোলে।
ধলেশ্বরী প্রাণেশ্বরী তোমায় আমি স্মরি,
জলভরা মনোহরা আমার জলেশ্বরী।

বাংলার মাটি

রকিবুল ইসলাম

ঘর থেকে আমি বের হয়ে রোজ এদিকে ওদিকে হাঁটি
হাঁটতে হাঁটতে যাই যে পেরিয়ে সবুজ এ বাংলার মাটি।
বাংলার মাটি অপরূপ খাঁটি সোঁদা গন্ধের মায়া...
কত শত গাছ লতাপাতা এই মাটিকে দিয়েছে ছায়া।
মাঠের মাটিতে কৃষকের হাসি ফুল হয়ে ডাকে, আয়
পথের মাটিরা হেসে বারে বারে চুমু দেয় দুটি পায়।
পুকুরে নামি জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে কত যে সাঁতার কাটি
জলের অতলে শরীর বিছিয়ে রয়েছে নরম মাটি।
শহরে নগরে পিচঢালা পথ ইট ও পাথর ছুঁয়ে
পরতে পরতে বাংলার মাটি সেখানে রয়েছে শুয়ে।
হাঁটি হাঁটি পা হাঁটতে শেখা এই মাটিতে এসে...
মাটিতে হাসি মাটিতে মিশি মাটিকেই ভালোবেসে।

আকাশ

শাহনাজ

লকডাউনের দিন বোধ হয় আসবে না
এটাই চেয়েছে মজুর আর মানুষ
করোনার প্রবল সময় বহাল রয়েছে
তবু লকডাউন তুলে নেওয়ার সাহস দেখিয়েছে পৃথিবী
এটাই নিয়তি!

বাবা

খান আসাদুজ্জামান

তোমার হাতটি ধরে বাবা
প্রথম বাইরে আসা
ফুল বাগানের হাসি দেখে
আমার খুশির হাসা।
আমার জীবন মধুর করো
অপত্য এক মায়া
তুমি আমার মায়া বাবা
তুমি আমার ছায়া।
বৃষ্টি রোদে ঝড় ঝঞ্ঝায়
মাথায় ধর ছাতা
সকল ঝুঁকি নিজে নিয়ে
আমার বাঁচাও মাথা
নিজের সকল দুঃখ ভুলে
আমায় দাও যে ছায়া।
তোমার পিঠে সওয়ার করাও
আমার হও যে ঘোড়া
আমার হাসি খুশি তুমি
তোমার তুলনা তুমি
কাঁধে নিয়ে মেলায় ঘোরাও
রুমালে দাও ছায়া।
আমার অসুখবিসুখ হলে
মায়ের সাথে জাগে
দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার আনো
আমায় কোলে রাখ।
কোথায় পাব এমন দরদ
কোথায় পাব ছায়া।

তুমি হাসলে

সাদিয়া সুলতানা

কতগুলো দিন পার হলো
কোথাও ফোন করে খোঁজখবরে এ কথাই শুনি
আমি কিন্তু বলতে পারি না
মনে হয় অহর্নিশ একটি দিন চলছে মাত্র
বলি না মনের কথা
শুনে সবাই বলবে জানি
এ কারণে কবিরা সমাজে অনাসৃষ্টি
সৃষ্টি করে অনায়াসে
কানে আসে কথার জবাব দেবেন না...
'ফোন করলেন কেন'?
তুমি শুনে হাসো
এটুকুই সান্ত্বনা এ জীবনে।

গা ছুঁয়ে যাও বর্ষা যত

অদ্বৈত মারুত

বেণী খুলে কতবার নাক ঘষে দিয়েছি হে বর্ষা তোমায়
কতবার আগুন ঠোঁটে চুমু খেয়েছি; নদী সাঁতরে উঠে–
এসেছি কতবার ওই পাহাড় চূড়ায়! বাধা দিতে কই?
তুমি হুড তোলা রিকশার মতো চুপচাপ মায়াবী ফুল
সামনের সারিতে বসা সাদা ওড়না জড়ানো নাকফুল
পায়ে পায়ে নামা দুপুরে মাথা গুঁজে ঘুম; বাধা দিতে কই?
বাইরে এখন বৃষ্টি নামার ধুম। খুনসুটি সুমনা
ভেতর-বাহির উত্তাপিত জ্বরে; আগুনও গনগনা
গা ছুঁয়ে যাও অবিরত বর্ষা যত; হোক বনিবনা
এসো এসো প্রমত্ত হও এই আষাঢ়ে; ভালো আছে তো হে!

জাতির পিতা

সুষমা ফাল্গুনী

বঙ্গবন্ধু তুমি জাতির পিতা
বাঙালির বুকে জাগালে মুক্তির আশা
জাগালে সাহস, দিলে প্রেরণা
জাগলো যত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।
তোমার স্বাধীনতার বাণী
অভয় দিল আনি
বাঙালি তাজা রক্তে শত্রু করে জয়
আনলো মহান স্বাধীনতা।
তুমি অমর, ইতিহাসে উজ্জ্বল
তুমি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা।

কবরের ডাক

রুস্তম আলী

আযানের মধুর ধ্বনি শুনে–
আকাশ বাতাস পশুপাখি
তরুলতা করে মোনাজাত
আমরা শুনে মর্ম বুঝে পড়ি নামাজ।
কবরের ডাক–
আমরা কি শুনি
কবর ডাকে নীরব নিস্তব্ধে অন্ধকারে
তা শুনে অন্তর আত্মা
যেন লাবিদের কবিতা।
নাই সেখানে আলো, জ্বলে না বাতি
সাড়া দিতেই হবে, সে ডাকে
ছেলেমেয়ে কাঁদবে সবাই
হবে না কেহ সাথি।
কবর ডেকে বলে–
শান্তি যদি পেতে চাও
দীনের আলো আনো সাথে
তোমার সম্বল ঈমানের বল
হিসাব করো কবরে যাবার পথে।

শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা

ইজামুল হক

আমি এক ভাগ্যবান শ্রোতা
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা
শুনেছি আমি।
যে কবিতায় ছিল–
বঞ্চনার কথা অধিকার আদায়ের
বলিষ্ঠ উচ্চারণ;
একই সাথে যুদ্ধ ও শান্তির বাণী।
যে কবিতার মন্ত্রবলে–
প্রেমিক ভুলে গেল
প্রেমিকার গভীর কালো চোখ
সন্তান ভুলে গেল
মায়ের আঁচলের ঘ্রাণ
বীজতলা ভুলে গেল মাঠের কৃষক
ছাত্ররা ভুলে গেল
প্রিয় পাঠকক্ষের কথা
মাস মাহিনার কথা ভুলে গেল
মিলের শ্রমিক।
অথচ
সে কবিতা উচ্চারিত হয়নি
কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে
কিংবা
কোনো দর্শনীয় বিনিময়ে শুনতে হয়নি
সে কবিতার অমর বাণী।
সে কবিতার দুটো লাইন
আজো ভুলিনি আমি–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

মাতৃভূমি

মালিহা হোসেন

মা যখন সন্তান ছুঁতে চায় না
মায়ের আদরে বুকে তুলে নাও করোনার লাশ
তোমার থেকে কোথাও আর ছড়ায় না
বিনাশ... মৃত্তিকা,
যুদ্ধের সময় তার আগে, পরে
অজস্র তোমার সন্তান, কোলে তুলেছ অবিরত
সত্যি কী অন্তিম সময়ে চেতনাজুড়ে
থাকবে মা তুমি হে মৃত্তিকা
তখন সত্যিই যদি মনে হয়
'আহা যদি আমি মাটি হইতাম।'
জীবন অজস্র পদভারে অনুভব করেছ কেমন আর আজ...।
সারা দুনিয়া তোমার মতো অসহ্য নীরব
সঙ্গরুদ্ধ জীবনে পাখি কি নিরাপদে উড়ে?
উড়ে যায় না মৃত্তিকা
থাকে সন্তান বুকে অনন্তকাল।

অদম্য করোনাযোদ্ধা অন্তিম যাত্রাপথের বন্ধু

এস আর সবিতা

করোনার আক্রমণে নাস্তানাবুদ সৃষ্টির সেরা মানবজাতি। বিশ্বের উন্নত-অনুন্নত দেশের মানুষ করোনার ভয়ংকর থাবায় অসহায়। তবে মানুষ সবকিছু জয় করেছে আপন প্রচেষ্টায়। বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রমে করোনা মোকাবিলায় সফলতা আসবে– এই প্রত্যাশা জগৎবাসীর। মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে মানুষ করোনা মোকাবিলায় এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের করোনাযোদ্ধাদের করোনাযুদ্ধে দায়িত্ব পালনে তাঁদের সাহস ও বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা/কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানসহ হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মীগণ করোনা মোকাবিলায় সাহসিকতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। তারা সকলেই করোনাযোদ্ধা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়– 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' আত্মত্যাগই মানুষের জীবনকে করেছে মহিমান্বিত।

করোনা পালটে দিয়েছে মানবসমাজকে। করোনায় মৃত্যু হলে কখনো কখনো লাশ পড়ে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভয়ে পরিবারের সদস্য কিংবা নিকটাত্মীয় এমনকি প্রতিবেশীরাও কাছে আসছে না। করোনায় আক্রান্ত সন্দেহ করেই মাকে রাস্তায় ফেলে পালিয়েছে তার প্রিয় ছেলে। করোনা বিপত্তিকালের প্রাথমিক পর্যায়ে হতবিহ্বল মানুষের এমন বেশ কয়েকটি অমানবিক দুর্ঘটনা ঘটলেও নিজের জীবন তুচ্ছ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যে-কোনো মৃতদেহের অন্তিম যাত্রাপথে বন্ধুর মতো এগিয়ে এসেছেন বীর বাঙালির দামাল ছেলেরা। তারা প্রিয়জনের মতো লাশ দাফনে হয়েছেন ব্যাপৃত। তাদের বীরত্বগাথা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। স্বেচ্ছাসেবক কিংবা স্বেচ্ছাসেবকদলের সকলের কথা নয়, প্রতীকি হিসেবে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা হলো:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদিত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রহমতে আলম সমাজসেবা সংস্থা এবং আল মারকাজুল ইসলামী নামক তিনটি সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা করোনা ভাইরাসে মৃত ব্যক্তিদের দাফন কাজে সহায়তা করছে। এই সংস্থাগুলোর স্বেচ্ছাসেবক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে জানা যায়, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে সংস্থাগুলো কাজ করছে। এছাড়াও অনেকে স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করে এ কাজে সহায়তা করছেন। অনেকে এগিয়ে এসেছেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির দাফন কার্যক্রম সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মো. সাইফুল্লাহিল আজম। তার সঙ্গে বিকল্প কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন যুগ্ম সচিব (বাজেট) ড. মো. এনামুল হক।

মো. সাইফুল্লাহিল আজম বলেন, করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিদের দাফন কার্যক্রমে সরকারকে সহযোগিতা করছে তিনটি সংস্থা। কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, স্বজনের নম্বরসহ বিস্তারিত তথ্য দিয়ে ঘটনাস্থল কোন সংস্থার কাছে, সেই সংস্থাকে সৎকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাড়িতে কেউ মারা গেলেও স্বজনেরা সংস্থাগুলোকে জানালে সংস্থার পক্ষ থেকে ফোকাল পয়েন্ট বা বিকল্প কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

লাশ সৎকারে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আইসিআরসি) বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে বলে উল্লেখ করে যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মো. সাইফুল্লাহিল আজম জানান, সংস্থা তিনটির স্বেচ্ছাসেবকদের ভিডিও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে ১০০ জনের একটি দল করার কথা জানিয়েছে। রাজধানীতে মুসলমান এবং হিন্দুদের লাশ সৎকারে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সাইফুল্লাহিল আজম ২৪শে মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের (ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ফর দ্য সেফ ম্যানেজমেন্ট অব অ্যা ডেড বডি ইন দ্য কন্টেক্স অব কোভিড-১৯) কথা উল্লেখ করে বলেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তি ভাইরাস ছড়ায় না। মৃতদেহ নিজ নিজ ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী জানাজা, দাফন বা সৎকার করা যাবে। সরকারি এই কর্মকর্তার আহ্বান, 'আসুন, মৃত ব্যক্তিদের সম্মান দিই। আতঙ্কিত না হই। করোনা ভাইরাসে যাঁরা মারা যাচ্ছেন, তারা তো আমাদেরই কেউ। শেষবিদায়টুকু সম্মানের হোক। আর যারা সৎকারে অংশ নিচ্ছেন, তারা অবশ্যই যথাযথ ব্যবস্থা মেনে চলবেন।'

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকেও এক বিজ্ঞপ্তিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে মৃত ব্যক্তির দাফন ও জানাজায় 'করোনা (কোভিড-১৯) রোগে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ নিরাপদভাবে দাফন/সৎকার/ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি)' অনুসরণ করার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবক দল ২২শে মে পর্যন্ত দুই শতাধিক মরদেহ দাফন ও সৎকার করেছে। মৃতদের দাফনে সারা দেশে প্রায় ৩০০ স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন এ দলে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের দাফন কার্যক্রমের সমন্বয়ক সালেহ আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, করোনায় মৃত অনেক ব্যক্তির মরদেহই ফেলে যাচ্ছেন তাদের স্বজনেরা। এমন খবর প্রকাশিত হওয়ার পর

দাফনের জন্য করোনায় মৃত লাশ নিয়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা

সংগঠনের পক্ষ থেকে করোনায় মৃত ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। করোনা পজিটিভ ও করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন মরদেহ সৎকারে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়। ৭ই এপ্রিল থেকে ওই স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ শুরু করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিধি মেনে হাসপাতাল বা বাসায় গিয়ে মরদেহ গোসল করানো, কাফনের কাপড় পরানোসহ পুরো দাফন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন স্বেচ্ছাসেবকরা।

সালেহ আহমেদ আরো বলেন, কোয়ান্টামের পক্ষ থেকে শুধু মুসলিম নয়, হিন্দু ধর্মের কেউ মারা গেলে তার সৎকারের জন্যেও আলাদা টিম কাজ করছে। নারী মরদেহের জন্যে কোয়ান্টামের নারী স্বেচ্ছাসেবী দল রয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাসপাতাল বা বাসায় গিয়ে মৃত ব্যক্তির গোসল, অজু, কাফনের কাপড় পরানোসহ সব কাজ সম্পন্ন করি আমরা।

শেষ বিদায় জানাচ্ছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন স্বেচ্ছাসেবী দল

মরদেহ দাফনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে সালেহ আহমেদ বলেন, কবরস্থানে মৃত ব্যক্তির পরিবারের হাতেগোনা কয়েকজন থাকেন। কখনো কখনো কেউই থাকেন না। মানুষ মৃত্যুর পরও যখন এমন অসহায়, তখন মনে হয় আমরাই তার পরিবারের লোকজন। শেষবারের যাত্রায় আমরা তাকে সেভাবেই সম্মানের সঙ্গে বিদায় জানাই।

'লাশের কথা জানিয়ে টেলিফোনে মেসেজ পাওয়ার পর থেকে শুরু হয় কাজ। লাশের গোসল থেকে শুরু করে দাফনসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ঘরে ফিরি। সুরক্ষা পোশাক পিপিই, হাতে গ্লাভস, চোখে চশমাসহ পুরো পোশাক পরে গরমের মধ্যে কাজ করা যে কতটা কষ্টসাধ্য, তা বলে বোঝানো যাবে না। বেশির ভাগ সময় মৃত ব্যক্তিদের স্বজনেরাও কাছে আসেন না ভয়ে। তবে আমরা ভয় পাই না। এই মৃত ব্যক্তিরা তো আমাদেরই কারও না কারও স্বজন।'

করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া এক ব্যক্তির লাশের সৎকার প্রক্রিয়া শুরু করার আগে টেলিফোনে একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদককে এই কথাগুলো বলেন ২৪ বছর বয়সি জারিফ কাবির। তিনি কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থা রহমতে আলম সমাজসেবা সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রহমতে আলম সমাজসেবা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হলেন মো. আতাউর রহমান। সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক মহাসচিব আতাউর রহমান বললেন, এক বছর আগে থেকেই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করতে চাচ্ছিলেন। মূলত অবহেলিত মুয়াজ্জিনসহ আলেম-উলামাদের জন্য কিছু করতে চাচ্ছিলেন। করোনা ভাইরাসের বিস্তারে যখন মৃত ব্যক্তির স্বজনেরাই ভয়ে লাশ ফেলে চলে যাচ্ছে বা কাছে আসছে না, এ ধরনের পরিস্থিতিতে আলেম, হাফেজ, আইনজীবীসহ সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে লাশ সৎকারের কাজ শুরু করেন।

আতাউর রহমান বলেন, যে স্বেচ্ছাসেবকেরা লাশ সৎকারের কাজ করছেন, তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা যেহেতু বাড়ি ফিরতে পারছেন না তাই একটি মাদ্রাসায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি নিজেও একদিন জানাজায় অংশ নিয়েছি। দিন দিন আমাদের কাজের চাপ বাড়ছে। সৃষ্টিকর্তার কাছে শুধু দোয়া করি, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আর যাতে কাউকে মৃত্যুবরণ করতে না হয়। আর কেউ মারা গেলে তার স্বজনেরা যাতে ভয় না পান। তার শেষ বিদায়টা নিয়ম মেনে করেন। লাশের পাশে থাকেন।

আল মারকাজুল ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হামযা শহীদুল ইসলাম জানান, তার সংস্থা এ পর্যন্ত ৭০টি লাশের সৎকার করেছে। কিশোরগঞ্জ ও মানিকগঞ্জে দুটি দল কাজ করার অনুমোদন পেলেও ঢাকায় সংক্রামিত হয়ে মারা যাওয়ার সংখ্যা বেশি থাকায় ওই দুটি দলও বর্তমানে ঢাকায় কাজ করছে।

'পাবনায় করোনায় মৃতদের দাফনে পরমাত্মীয় স্বেচ্ছাসেবীরাই' শীর্ষক রিপোর্ট ২২শে জুন ২০২০ *সাগর কন্যা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের প্রথমে বলা হয়, পাবনায় করোনা আক্রান্ত কিংবা উপসর্গে মৃতদের শেষকৃত্য সম্পাদনে ভুক্তভোগী পরিবার ও প্রশাসনের আস্থা নির্ভরতায় পরিণত হয়েছেন একদল স্বেচ্ছাসেবক। ধর্মীয় রীতি মেনে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী তারা সৎকার করছেন সব ধর্মের মানুষেরই মরদেহ।

জানা যায়, পাবনা জেলায় একমাত্র ভরসা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ও তহুরা আজিজ ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবীরা। বিগত এক মাসে জেলায় করোনা আক্রান্ত কিংবা উপসর্গে মারা যাওয়া ১৫ জনের মরদেহ সৎকার করেছেন তারা। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সৎকার করা মরদেহের মধ্যে একজন খ্রিষ্টান ও দুজন হিন্দু ব্যক্তিও রয়েছেন।

শহরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের বাসিন্দা জেমস সুব্রত গোস্বামী করোনা উপসর্গে মারা যান। আতঙ্কে স্বজন ও সম্প্রদায়ের মানুষ শেষকৃত্যানুষ্ঠানে আসেনি। পাবনা ব্যাপ্টিস্ট মিশনের খ্রিষ্টান কবরস্থান কমিটির সভাপতি কলিট তালুকদার বলেন, স্বেচ্ছাসেবীরা এই দুঃসময়ে যেভাবে কাজ করছে তা করোনাকালে স্বার্থপরতা আর অমানবিকতার বিপরীতে মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত, সাম্প্রদায়িকতা আর হিংসাবিদ্বেষে ভরা সমাজের জন্য অনন্য এক শিক্ষা।

করোনায় মৃত্যুবরণকারী রোগীর মরদেহ দাফন বা সৎকারের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কাজে এগিয়ে এসেছেন হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) সভাপতি এম শাহাদাত হোসেন তসলিম। করোনা আক্রান্ত রোগীদের পরিবহণ ও মরদেহ দাফনে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আল-রশীদ ফাউন্ডেশন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত এই ফাউন্ডেশন নিজ অর্থায়নে একটি ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্স ও রোগী পরিবহণের দুটি অ্যাম্বুলেন্স কিনেছে। তৈরি করেছে ৩০ সদস্যের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আলেম ও স্বেচ্ছাসেবক দল। ইতোমধ্যে রাজধানীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আলেম ও স্বেচ্ছাসেবক দল পাঁচটি মরদেহ দাফন করেছে।

চট্টগ্রাম প্রতিদিনে ১৯শে জুন ২০২০ তারিখে প্রকাশিত 'করোনামুক্ত হয়েই আবার লাশ দাফনের কাজে দুই করোনাযোদ্ধা'

শীর্ষক রিপোর্ট পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো– 'ওয়াসিম আকরাম, নেয়ামত উল্লাহ ও হাফেজ আলী আজগর আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের তিন স্বেচ্ছাসেবক। এই মুহূর্তে এই সাহসী এই স্বেচ্ছাসেবকরাই করোনা রোগীর লাশ দাফন করাকে তারা জীবনের সবচেয়ে বড়ো ব্রত হিসেবে নিয়েছেন।

এই সাহসী কাজটি করতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকে নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ৯ দিনের মাথায় মুক্ত হয়ে তাদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক ওয়াসিম আকরাম ও নেয়ামত উল্লাহ আবারও ফিরেছেন লাশ দাফনের কাজে। গত ৩ মাস ধরে চট্টগ্রামে করোনায় মৃতদের লাশ দাফনের কাজ করে আসছে আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। এই সময় মোট ২১১টি লাশ দাফন করেছে তারা।'

শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন কাউন্সিলর মাকছুদুল আলম খোন্দকার খোরশেদ ও তার দল

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর মাকছুদুল আলম খোন্দকার খোরশেদ তার দল নিয়ে কোভিড-১৯ বা এ রোগের উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া লাশের দাফন ও দাহ করছেন। নিয়তি বণিক বলেন, 'বাবা মারা যাওনের পর কেউ কাছে আসে নাই। আমার আত্মীয়রাও আসে নাই, সবাই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিছিল। তবে এই দুর্দিনে কাউন্সিলর খোরশেদ ভাই দৌড়াইয়্যা আসছেন। আমি বাবার মুখে আগুন (মুখাগ্নি) দিছি, ভাই আমার হাত ধইরা পাশে ছিলেন। এইটাই তো অনেক বড়ো পাওয়া। বাবার সৎকারে যতটুকু নিয়ম পালন করা সম্ভব, তার সবই করছেন এ কাউন্সিলর ও তার দলের সদস্যরা।'

এই কাউন্সিলর ৮ই এপ্রিল থেকে কোভিড-১৯ মারা যাওয়া রোগী, করোনার উপসর্গ বা সন্দেহ করা হয়–এমন রোগীর লাশ এবং কিছু ক্ষেত্রে যক্ষ্মাসহ অন্যান্য রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের লাশও দাফন এবং সৎকার করছেন।

২০০৪ সাল থেকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত মাকছুদুল আলম খোন্দকার খোরশেদ বলেন, 'দেশের এই পরিস্থিতিতে কেউ মারা গেলে স্বজনেরাও ভয়ে কাছে যায় না। লাশ যাতে পড়ে না থাকে, যার যার ধর্ম অনুযায়ী যাতে লাশ দাফন বা সৎকার করা যায়, সেই চেষ্টা থেকেই ব্যক্তিগতভাবে কাজ শুরু করেছিলাম। বর্তমানে সিটি করপোরেশনের মেয়র থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, থানাসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর থেকে সহায়তা পাচ্ছি।' মাকছুদুল আলম খোন্দকার খোরশেদ কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিনের কাজের বিস্তারিত তথ্য ফেসবুকে দিচ্ছেন।

নারী-লাশ দাফনের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন এসআইপিএফ দলের নারী স্বেচ্ছাসেবীরা

চট্টগ্রামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এসআইপিএফের সদস্যরা নিজস্ব খরচেই করোনায় মৃত নারী মরদেহের গোসল কাফন শেষে দাফন করেন। এসআইপিএফ বলছে, আক্রান্ত হয়ে কিংবা উপসর্গ নিয়ে মৃত পুরুষের লাশ সহজেই গোসল করানো সম্ভব হলেও নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পর্শকাতর। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত না হলে ধর্মীয় রীতি মেনে এ ধরনের নারীদের মৃতদেহের গোসল ও কাফনের আয়োজন করা কঠিন। আর এই কঠিন কাজটিই সুচারুরূপে করছেন তারা। স্বেচ্ছাশ্রমে পরম মমতায় মৃত নারীদের গোসল করিয়ে শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করেন। এ দলে রয়েছেন ১৫ নারী। গত তিন মাসে চট্টগ্রাম মহানগরে করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মৃত ১০৯ নারীকে গোসল করিয়ে শেষ বিদায় জানিয়েছে এ মানবিক দল। এর নেপথ্যে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মোহাম্মদ শাহজাহান ও সেলিনা কানিজ নামের দুই ভাই-বোন।

এমন একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সকলের তথ্য বিস্তারিতভাবে দেওয়া সম্ভব না হলেও তাদের সবার জন্য রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন যারা– তারাই যোদ্ধা, তারাই প্রকৃত বীর। করোনায় মৃতের অন্তিম যাত্রাপথে বন্ধুর মতো কাছে থেকে আন্তরিকভাবে ধর্মীয় বিধিবিধান প্রতিপালন করে বিদায় জানানো একটি কঠিন কাজ। এই মহৎ কাজে নিজেকে সম্পৃক্তকরণ তাদের স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখবে। করোনা মহামারির দুর্যোগময় মুহূর্তে যারা করোনায় মৃতদের দাফন কাফনের মতো সাহসিকতার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখে অনন্য নজির স্থাপন করে এমন মানবিক কাজে যুক্ত হয়েছেন, তারা প্রশংসিত হচ্ছেন। আমরাও তাদের জয়গান গাই। তাদের সুস্থতা কামনা করি। বিশ্ব করোনামুক্ত হোক– এই প্রার্থনা করি কায়মনোবাক্যে।

লেখক: শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

শুদ্ধাচারের নীতি হোক জীবনের ভিত্তি

জিনাত আরা আহমেদ

আমরা মধ্যম আয়ের দেশ গড়তে যাচ্ছি, উন্নত দেশের স্বপ্ন এঁকেছি, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলছি। উন্নয়নের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি এবং সরকারি অফিসগুলোতে নীতি-নৈতিকতার চর্চা তথা শুদ্ধাচারের নীতি প্রতিপালনের জন্য কৌশল প্রণীত হয়েছে। অবশ্য পালনীয় নীতি হিসেবে এটা বাস্তবায়নে নানা কর্মসূচিও চলমান। সততা ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে দক্ষ জনশক্তি এবং নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সরকারের লক্ষ্য। দুর্নীতিকে আইনের মাধ্যমে রুখে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সাথে সাথে দরকার পারিবারিক মূল্যবোধ আর অনুশাসনের আবহে শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ।

শিশু প্রথমত পারিবারিক পরিবেশেই শৃঙ্খলা শেখে। বাবা-মায়ের পারস্পরিক বোঝাপড়া, অন্যদের সাথে আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন

বিষয়ে মত বিনিময় এসব কিছু শিশুর মানস গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তাছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিনের নির্দিষ্ট সময় কাটানোর ফলে সেখানের পরিবেশও শিশুর জীবনের ভিত্তি গড়ে দেয়। তাই শুদ্ধচিন্তার অধিকারী হতে পরিবার ও বিদ্যালয়কে হতে হবে শিশুদের মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্র। যাতে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত প্রতিটি শিশু বাবা-মা আর শিক্ষকের নৈতিক আদর্শে গড়ে উঠতে পারে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জাতীয় নীতিগুলোকে শৈশব থেকে আত্মস্থ করতে পারে।

অনেকের মধ্যে অর্থই জীবনের পরমার্থ এমন ধারণা কাজ করে। অন্যের কাছে নিজের বিত্ত-বৈভব প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাদের আরো বেশি উপার্জনে তাড়িত করে। এসব লোকেরা যেনতেন উপায়ে আয়ের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে– এসবই দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে এরা বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়, যার প্রভাব নেতিবাচকভাবে সন্তানদের জীবনেও পড়ে। অবৈধ উৎসের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সন্তানদের বেহিসেবি করে তোলে। তখন অধিক ব্যয়ের প্রবণতা ওদের শৃঙ্খলাহীন জীবনের দিকে ধাবিত করে। এটা কারো জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে না। বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতিযোগিতায় জীবন একপর্যায়ে অর্থহীন মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলো চর্চার মাধ্যমেই মানুষ অনাবিল সুখের সন্ধান পায়। তাই শৈশব থেকেই শিশুকে শেখাতে হবে জীবনে সুখী হবার মন্ত্র।

শিশু যে পরিবেশে বড়ো হয় সেখানকার সার্বিক বিষয় পরবর্তী জীবনে তার আচরণে প্রকাশ পায়। পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা পেলে সে অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। সমালোচনা করলে শিশু হীনমন্যতায় ভোগে। এ ধরনের পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুরা কাউকে শ্রদ্ধা করতে শেখে না। বাড়িতে কাজের লোকদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার তাকে সমাজের ছোটো-বড়ো সকলের সাথে সমান ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলে। কোনো জিনিসের প্রতি লোভের মাধ্যমেই দুর্নীতির সূত্রপাত। তাই শৈশব থেকে নির্লোভ চরিত্রের অধিকারী হতে শিশুকে সংযম শিক্ষা দিতে হবে। শিশুদের হাতে কখনই নগদ অর্থ দিতে নেই। বরং কাউকে কিছু দিতে পেরে আনন্দিত হওয়াকে শিশু যেন উপভোগ করতে পারে তার চর্চা থাকতে হবে। মোবাইল ফোনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কখন সেটা প্রয়োজন, এর জন্য বয়সের বিষয়টা বিবেচনায় নেওয়া দরকার। অনেক অভিভাবক শিশুকে মোবাইল ফোন ধরতে দেন, এতে এক ধরনের আসক্তি তৈরি হয়। আবার কোনো সচ্ছল অভিভাবক হয়ত স্কুল পর্যায়েই শিশুকে মোবাইল দেন, তার দেখাদেখি সাধারণ পরিবারের শিশু যখন বায়না ধরে তখন বাবা-মা বিব্রত হন। এ রকম পরিস্থিতিতে পরিবার এবং বিদ্যালয়ে নানা ধরনের সংকট তৈরি হয়। তাই নৈতিকতার সার্বিক বিষয়ে শিশুর বাবা-মায়েরও ধারণা থাকতে হবে।

সমাজ পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি থাকতে হবে সামাজিক উদ্যোগ। বড়োদের সম্মান করা, ছোটোদের স্নেহ, অন্যদের সহযোগিতা করার মনোভাব, আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়ের প্রবণতা, নীতি-নৈতিকতার বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যস্ত করে তুলতে শৈশবেই প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয় হলো শিশুর প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। শিক্ষক পিতামাতার ভূমিকায় থেকে প্রতিনিয়ত চর্চার মাধ্যমে শিশুকে নৈতিক গুণাবলি আত্মস্থ করতে সাহায্য করবেন। এভাবে শিশু কতটা অর্জন করল তার নিয়মিত দিনপঞ্জিতে সেটা যেন প্রতিফলিত হয়, এটা দেখা। এতে দুটো উপকার প্রথমত আত্মসমালোচনার মাধ্যমে সঠিক পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়, দ্বিতীয়ত লেখার অভ্যাস তৈরি হয়। রাস্তায় চলার সময় কোন দিক দিয়ে হাঁটতে হবে, দেখেশুনে রাস্তা পার হওয়া, যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা, সবক্ষেত্রে আইন মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে স্কুলগুলোতে নৈতিকতার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

শিশুকে নিয়ম শেখানোর পাশাপাশি নিজেরাও নিয়ম মেনে চললে অনেক বেশি কার্যকর হয়। আমরা যদি সময়-অসময়ে টিভি দেখি বা কাজের সময় ফোনে আড্ডা দেই তাহলে ছেলেমেয়েরাও নিয়ম মেনে দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত হবে না। বাচ্চারা কোনো অন্যায় করলে বুঝাতে হবে ভুলটা ভুলই, এক্ষেত্রে বাবা-মা উভয়েই সমমত পোষণ করবেন। সন্তানকে শাসনের ক্ষেত্রে অনৈতিক শব্দ প্রয়োগ কিংবা কারো সাথে তুলনা করা ঠিক না, এতে শিশুর আত্মবিশ্বাস কমে যায়। সন্তানদের কথা শোনা এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিলে ওরা বুঝতে পারবে যে, পরিবারে সেও একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ওর পছন্দ-অপছন্দের গুরুত্ব দেওয়া এবং কথাবার্তায়, আচার-আচরণে ইতিবাচক ইঙ্গিত থাকলে শিশু উৎসাহিত বোধ করে। শিশু কী ভালোবাসে, কিসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, কখন পড়তে চায়– এসব বিষয় মাথায় রেখে রুটিন তৈরি করা যেতে পারে। তবে একবার রুটিন তৈরি হয়ে গেলে তা যেন নড়চড় না হয়। যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন সন্তানকে সময় দেওয়া প্রয়োজন। এতে করে শিশু বাবা-মাকে ভালো করে চিনতে পারে। খাওয়ার টেবিলে আলোচনার ফাঁকে কিংবা অবকাশ ও বিনোদনের সময়গুলোতে সুস্থ ও রুচিশীল সামাজিকতার খুঁটিনাটি ওর মধ্যে গেথে দেওয়া যায়। এভাবে সন্তানের কাছে নিজেদেরকে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরা যায়।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুদেরকে যেভাবে গড়ে তুলব, সেভাবেই তারা গড়ে উঠে দেশের নেতৃত্ব দেবে। আগামীতে যাদের হাতে আমরা নেতৃত্ব তুলে দিতে চাই তাদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, খুলনা

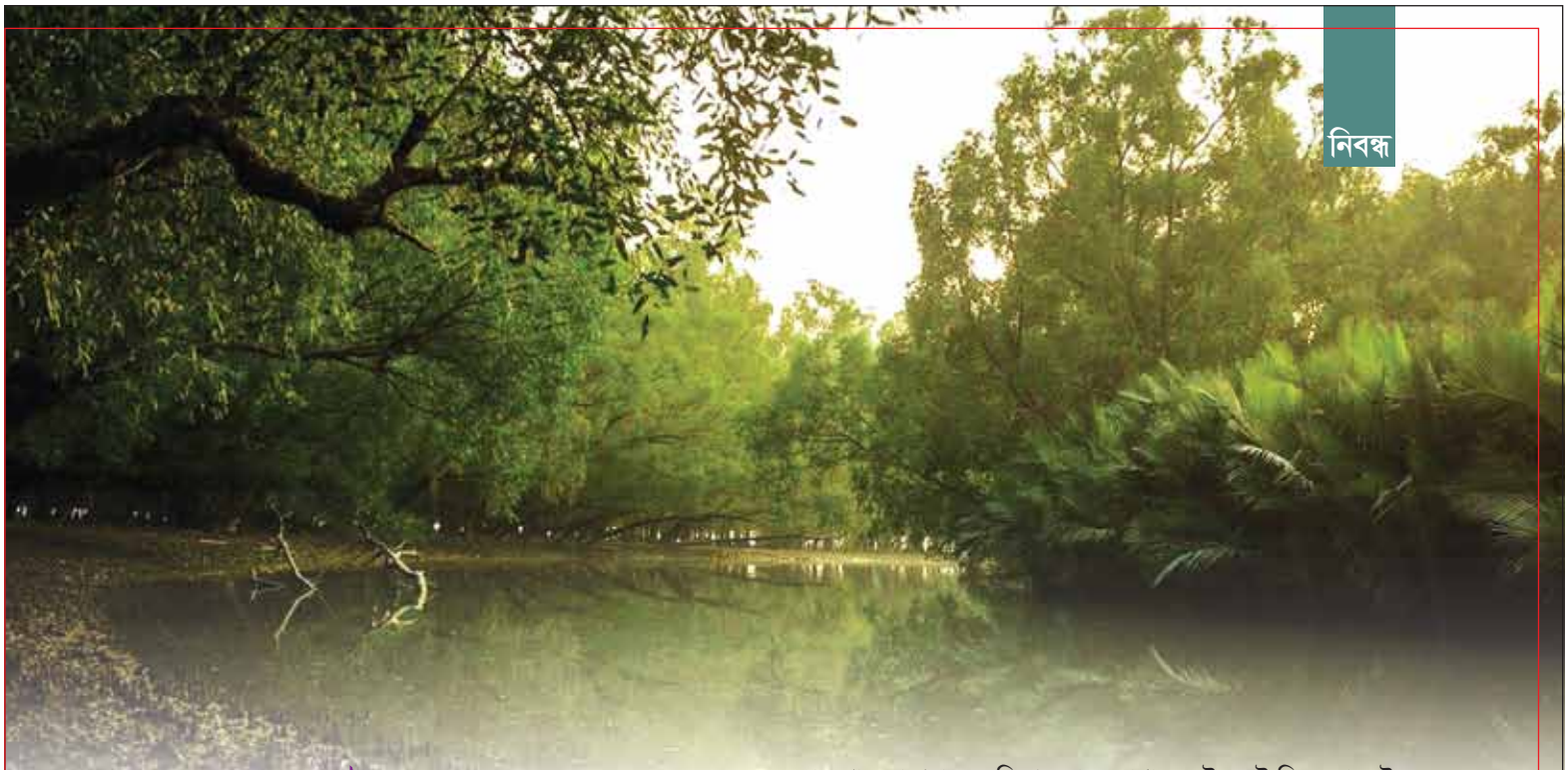

রক্ষাকবচ সুন্দরবন

ফাতেমা আক্তার হ্যাপি

'আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য। বঙ্গোপসাগরের পাশ দিয়ে যে সুন্দরবনটা রয়েছে এইটা হলো ব্যারিয়ার। এটা যদি রক্ষা না হয় তাহলে একদিন খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ এ পর্যন্ত সমস্ত এরিয়া সমুদ্রের মধ্যে চলে যাবে এবং এগুলো হাতিয়া সন্দ্বীপের মতো আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার যদি সুন্দরবন শেষ হয়ে যায়– তো সমুদ্র যে ভাঙনের সৃষ্টি করবে সেই ভাঙন থেকে রক্ষার উপায় আর নাই'– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৬ই জুলাই ১৯৭২ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্‌বোধনকালে একথা বলেছিলেন। সুন্দরবনের গুরুত্ব রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কাছে কতটা স্পষ্ট ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সদ্য স্বাধীন দেশেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সুন্দরবনকে রক্ষা করা না গেলে ঝড়-ঝঞ্ঝা ও পরিবেশ বিপর্যয় থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার আর কোনো উপায় নেই।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। বাংলাদেশের জন্য সুন্দরবনকে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদই বলা চলে। কোনো কিছুর বিনিময়েই যার কোনো ক্ষতি করা যায় না। যুগ যুগ ধরে ভয়ংকর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় থেকে এ দেশ ও জাতিকে রক্ষা করেছে এই সুন্দরবন। পরম এ বন্ধুটি আমাদের দেশের জন্য বারবার এনে দিয়েছে গৌরব ও সম্মান, দিয়েছে সুরক্ষা।

বিশ্বের ইতিহাসে যতসব ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হেনেছে, তার বেশির ভাগই হয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরে। 'ওয়েদার আন্ডারগ্রাউন্ড' নামের একটি ওয়েবসাইটে বিশ্বের ৩৫টি সবচেয়ে ভয়ংকর মৌসুমি ঘূর্ণিঝড়ের তালিকা রয়েছে। এই তালিকার ২৬টি ঘূর্ণিঝড়ই বঙ্গোপসাগরে। ঘূর্ণিঝড় আম্পান এ ধরনের ২৭তম ঘূর্ণিঝড়। ভয়ংকর এই ঘূর্ণিঝড় আবারো আমাদের বন্ধুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘূর্ণিঝড় বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে সুন্দরবন আমাদের কীভাবে সুরক্ষা দেয়।

বঙ্গীয় ব-দ্বীপের পাদদেশে গঙ্গা ও মেঘনার মোহনায় আবহমানকাল থেকে গড়ে ওঠা সুন্দরবন নিজ গুণেই অনন্য। এত বড়ো প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বা গরানবন বিশ্বের আর কোথাও নেই। এই বিবেচনাতেই ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল বা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' ঘোষণা করে। সুন্দরবন না থাকলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো রাজকীয় প্রাণী বা প্রতীক হয়ত বাংলাদেশ পেত না। সুন্দরবনের বৈশ্বিক এসব তাৎপর্যের পাশাপাশি এর সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, বনজ সম্পদ, সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যও আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সক্ষমতার উৎস। অনিন্দ্যসুন্দর এই বন ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কীভাবে নিরাপত্তার দেয়াল হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ রয়েছে অনেক। যে-কোনো ঘূর্ণিঝড়ের সময়ও খুব কাছে থেকে আমরা সেটা দেখেছি, অনুধাবন করেছি।

সাম্প্রতিক কালের ঘূর্ণিঝড় ফণীতে প্রাণহানি অতীতের তুলনায় সীমিত ছিল। এর প্রধান কারণ সুন্দরবন। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের পক্ষেও সুন্দরবনের 'প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রাচীর' ভেদ করা সহজতর হয়ে ওঠে না। ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সময়েও সুন্দরবন পয়েন্টে এসে এর গতি লক্ষণীয় হারে কমে গিয়েছিল। আরেকটু পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, ২০০৭ সালে সিডরে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি; অন্যদিকে ২০০৯ সালের আইলায় এই সংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশর কম। অথচ দুটি ঘূর্ণিঝড়েরই মাত্রা ছিল সমপর্যায়ের। তাহলে উভয়ের প্রাণহানি সংখ্যার এ বিশাল পার্থক্যের কারণ কী? এর উত্তর কেবলই একটি, সুন্দরবন। সিডর আঘাত হেনেছিল দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, যেখানে সুন্দরবন নেই। আর আইলা আঘাত হেনেছিল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, যেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরবন। এজন্যই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বা ভোলা-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম উপকূলে যদি সুন্দরবনের মতো আরেকটি 'প্রাকৃতিক সুরক্ষাপ্রাচীর' থাকত, তাহলে ১৯৯১ সালে ১ লাখ ৩৮ হাজারের বেশি মূল্যবান প্রাণ হয়ত হারাতে হতো না। ভোলায় যদি সুন্দরবনের মতো সবুজ সুরক্ষা থাকত, তাহলে ১৯৭০ সালে স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে পাঁচ লাখ প্রাণ হয়ত ভেসে যেত না জলোচ্ছ্বাসে। এতেই সুস্পষ্ট হয়, অন্ধকার ঘনকালো বিপদ থেকে রক্ষায় সুন্দরবন আমাদের কতটা প্রয়োজনীয়। এ জন্য ঘূর্ণিঝড় এলেই আমাদের সুন্দরবনের কথা মনে পড়ে। আমরা সুন্দরবনের দিকে তাকিয়ে থাকি। বন্ধুবর সুন্দরবন আমাদের বরাবরের মতোই বাঁচিয়ে দেয়। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের প্রায় অনিবার্য অনুষঙ্গ জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলাতেও সুন্দরবনের দ্বিতীয় বিকল্প পাওয়া যায় না। যে কারণে আমরা দেখি, জলোচ্ছ্বাসে গা শিউরে ওঠা যেসব গল্প, তার বেশিরভাগই আসলে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের। অর্থাৎ যে অংশে

সুন্দরবন নেই। সুন্দরবনের জন্য আইলা ছিল বড়ো আঘাত। এর ৪০ শতাংশ গাছপালা ও জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়েছিল সেই ঝড়ে। নিজের বুক ক্ষতবিক্ষত করে বাংলাদেশকে সেদিন বাঁচিয়েছিল আমাদের এই পরম বন্ধু। সুন্দরবনের আরেকটি অলৌকিক দিক হচ্ছে, বাইরে থেকে আমরা যদি 'ডিস্টার্ব' না করি, এই বন নিজে নিজেই নিজের ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারে।

গত কয়েক দশকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বাংলাদেশের নীতি ও অবকাঠামোগত সামর্থ্য অনেক বেড়ে গেছে। আমরা যেভাবে ৭১০ কিলোমিটার উপকূলজুড়ে আড়াই হাজারের বেশি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করতে পেরেছি এবং শক্তিশালী পূর্বাভাস ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কারণে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লাখ লাখ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারছি, তা উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের জন্যও বিস্ময়ের। যে কারণে ২০০৫ সালে হারিকেন ক্যাটরিনার মুখোমুখি যুক্তরাষ্ট্রে দাবি উঠেছিল বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়ার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে নদী, পানি, পরিবেশ, প্রতিবেশ বিষয়ে কতটা সংবেদনশীল তা আমরা জানি। তাঁর এই সংবেদনশীলতার স্বীকৃতি খোদ জাতিসংঘ থেকে এসেছে। ২০১৫ সালে তিনি পরিবেশের নোবেল খ্যাত 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার পান।

বর্তমানে সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন হচ্ছে ৬ হাজার ১৭ বর্গ কিলোমিটার, যা দেশের সংরক্ষিত বনভূমির ৫১ ভাগ। ২৬শে মার্চ থেকে গোটা সুন্দরবনে সব ধরনের পর্যটকসহ জেলে-বনজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করে বন অধিদপ্তর। ২৪ ঘণ্টায় ২ বার সমুদ্রের জোয়ারের পানিতে প্লাবিত এই লবণাক্ত বনভূমিতে সব ধরনের পর্যটকসহ জেলে-বনজীবীরা না থাকায় ছিল না কোনো কোলাহল। নির্ভয়ে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রকৃতির পাহারাদার রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল ও মায়া হরিণসহ সব বন্যপ্রাণী।

বনের কর্মকর্তাসহ বনরক্ষীরা এখন প্রায় প্রতিনিয়তই শুনতে পান বাঘসহ এসব বন্যপ্রাণীর ডাক। সহজেই চোখে পড়ছে বাদরের বাঁদরামী। বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ইরাবতী ডলফিনসহ ৬ প্রজাতির ডলফিন দল বেঁধে পানির উপরিভাগে খেলা করছে। সহজেই দেখা মিলছে কুমির ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির বাটাগুল বাচকা কচ্ছপের। নির্ভয়ে ঘুরে ফিরছে অজগর, কিংকোবরাসহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ। বন মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙছে বনের কর্মকর্তাসহ বনরক্ষীদের। বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ করে গাছের এডাল থেকে ওডালে উড়ে ফিরছে। সৃষ্টির পর এই প্রথম যেন সুন্দরবন স্বাভাবিক রূপে ফিরতে শুরু করেছে। দিনরাত ২৪ ঘণ্টায় ৬ বার তার রূপ পালটানো সুন্দরবন কোনো উপদ্রব ছাড়াই পেয়েছে নতুন প্রাণ। বাগেরহাটের পূর্ব ও খুলনার পশ্চিম সুন্দরবন বিভাগের ৪টি রেঞ্জের বিভিন্ন ফরেস্ট অফিস, টহল ফাঁড়ির কর্মকর্তারা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইটের পাশাপাশি বিশ্বের বৃহৎ জলাভূমিও। সুন্দরবনের জলভাগের পরিমাণ ১ হাজার ৮৭৪ দশমিক ১ বর্গ কিলোমিটার, যা সমগ্র সুন্দরবনের ৩১ দশমিক ১৫ ভাগ। ১৯৯২ সালে সমগ্র সুন্দরবনের এই জলভাগকে রামসার এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ।

এছাড়া সুন্দরবনের সমুদ্র এলাকার পরিমাণ ১ হাজার ৬০৩ দশমিক ২ বর্গ কিলোমিটার। এই জলভাগে ছোটো-বড়ো ৪৫০টি নদী ও খালে রয়েছে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ইরাবতীসহ ৬ প্রজাতির ডলফিন, ২১০ প্রজাতির সাদা মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ১৪ প্রজাতির কাঁকড়া, ৪৩ প্রজাতির মলাস্কা ও ১ প্রজাতির লবস্টার। সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬৮ দশমিক ৮৫ ভাগ অর্থাৎ ৪ হাজার ২৪২ দশমিক ৬ বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে স্থল ভাগ। সুন্দরী, গেওয়া, গরান, পশুরসহ ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। এছাড়া ৩৭৫ প্রজাতির বন্য প্রাণীর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও হরিণসহ ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, লোনা পানির কুমির, গুইসাপ, কচ্ছপ, ডলফিন, অজগর, কিংকোবরাসহ ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ ও ৩১৫ প্রজাতির পাখি রয়েছে। ইতোমধ্যে সুন্দরবন থেকে হারিয়ে গেছে ১ প্রজাতির বন্য মহিষ, ২ প্রজাতির হরিণ, ২ প্রজাতির গণ্ডার, ১ প্রজাতির মিঠা পানির কুমির।

সম্প্রতি প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' সুন্দরবনের ওপর দিয়ে দুর্বল হয়ে খুলনা উপকূল অতিক্রম করে। সুন্দরবনের গাছপালায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েই মূলত দুর্বল হতে শুরু করে ঘূর্ণিঝড়টি। 'আম্পান' যে গতি নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল তার প্রভাব আটকে দিয়েছিল সুন্দরবনের গাছপালা। ভারতে 'আম্পানের' মূল আঘাতের পর ২শ মাইলের মধ্যে থেকেই সুন্দরবন বাতাসের গতিবেগ প্রতিরোধে ভূমিকা নিয়েছে। ভারতে মূল ঝড়ের আঘাত ১৮০ কিলোমিটার হলেও খুলনায় এ আঘাত ৯০ কিলোমিটারের মধ্যেই ছিল। বাংলাদেশে আঘাত হানার আগেই সুন্দরবন এর শক্তি কমিয়ে দেয়। ফলে এই ঝড়ে যে পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি ক্ষতির হাত থেকে উপকূলের মানুষ ও সম্পদ রক্ষা পেয়েছে। এর জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতাও ৩ থেকে ৪ ফুট কমিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো এই শ্বাসমূলীয় বনটি।

সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে বন বিভাগের গঠিত চারটি কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আম্পানের আঘাতে সুন্দরবনের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বনের ১২ হাজার ৩৫৮টি গাছ ভেঙে গেছে। আর বন বিভাগের অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দুই কোটি ১৫ লাখ টাকা। তবে সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মৃত্যু কিংবা আহতের খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষতিগ্রস্ত এসব গাছের মধ্যে গরান গাছের সংখ্যা বেশি।

সুন্দরবন নিয়ে গবেষণা করা প্রতিষ্ঠান সেভ দ্য সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম জানান, সুন্দরবনকে তার মতো করে থাকতে দিলে আগামী ৫ থেকে ৬ মাসের মধ্যে এই বনটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। গত দেড়শ বছরে ৭৫টি প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সুন্দরবন। তারপরও সুন্দরবন ঘুরে দাঁড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, নিকট অতীতে সুন্দরবন সুপার সাইক্লোন সিডর, আইলা, বুলবুলের ক্ষত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবারই ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে সুন্দরবন উপকূলের কোটি মানুষের জীবন রক্ষা করে চলেছে। এখন সময় এসেছে সুন্দরবনকে রক্ষায় আমাদের সচেতন হওয়ার। সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. বশিরুল আল মামুন সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের আঘাতে সুন্দরবনের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে সুন্দরবন থেকে সব ধরনের গাছ কাটা নিষিদ্ধ রয়েছে। যে কারণে আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেগুলো ওভাবেই থাকবে, কোনো গাছ কাটা হবে না। বন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

বর্ষার প্রকৃতি ও রূপ

লতা খান

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত
ছয়টি পাখি ছয়টি রূপে এসে বাংলাদেশে
ছয়টি সুরে করে ডাকাডাকি।

এ গানটিতে ফুটে উঠেছে ঋতু বৈচিত্র্যের প্রকৃতি ও রূপ। বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। দুই মাস পর পর ঋতু পরিবর্তন হয়। প্রতিটি ঋতুই যেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পালাক্রমে আসে এবং দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে করে তোলে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। মনকে করে বিমোহিত। এ ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাকাল হচ্ছে দ্বিতীয়। গ্রীষ্মের পর এর আবির্ভাব। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেই ঘটে এর উন্মুক্ত প্রকাশ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বর্ষাকাল এই দুই মাসের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। ভরা ভাদ্র পেরিয়ে আশ্বিন পর্যন্ত রূপের পসরা সাজিয়ে সে অবস্থান করে। বর্ষার আগমন রীতি যেমন বিচিত্র, তেমনি অভিনব। লুকোচুরি যেন সে পছন্দ করে না। এক মনোরম সংগীতের তালে রুমুঝুমু ছন্দ তুলে সমগ্র চরাচরকে জানিয়ে সে আসে। কালবৈশাখির গুরুগর্জন, আকাশে নবীন মেঘের সমারোহ, বিদ্যুতের শিহরণ, অশান্ত বারিপাতের শব্দে ঘোষিত হয় এর আগমনি বার্তা। এসময় সে আপন মনের মাধুরি সাজিয়ে বাংলার প্রকৃতিকে সবুজে সবুজে একাকার করে তোলে।

বর্ষার অবিরল অবিচ্ছিন্ন ধারায় নদীনালা, খালবিল, মাঠঘাট সব পানিতে তলিয়ে যায়। পল্লির মাঠঘাটে জল থৈ থৈ করে। প্রকৃতির বুকে তখন বাদল-বাতাসের অশান্ত মাতামাতি শুরু হয়। একটানা বর্ষণে স্নাত হয় পৃথিবী। তৃষ্ণার্ত প্রকৃতি হয় শান্ত। বৃষ্টি বিধৌত মাটির সোঁদা গন্ধে ভরে ওঠে মন। পত্রপল্লবে, টিনের চালে বৃষ্টির ছন্দময় পতন আবেগে বিহ্বল করে হৃদয়। জলচর প্রাণীরা বর্ষার বৃষ্টি নবজীবনের আনন্দে মেতে ওঠে। ব্যাঙের অবিশ্রান্ত ডাকে মুখর হয়ে ওঠে ডোবানালা ও পুকুর ধার। আকাশে কালো মেঘের আহ্বানে ময়ূর তার পেখম মেলে। নদীর সৌন্দর্যের চরম প্রকাশ ঘটে বর্ষাকালে। এর আগমনে নদী হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ, দুরন্ত এবং চঞ্চল। কলকল ছলছল শব্দে সে ছুটে চলে সাগরপানে। নদীর বুকে রংবেরঙের পাল তোলা নৌকা চলা, মাঝির ভাটিয়ালি গান, বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, ডিঙি নৌকায় জেলেদের মাছ ধরা, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে পদ্মায় ইলিশ শিকার, দুরন্ত গ্রাম্য বালকদের কলাগাছের ভেলায় চড়ে ভেসে বেড়ানো এবং শাপলা ফুল আহরণ– সবই বর্ষার দান। বর্ষা তৃষিত ভূমিকে জলদানে পরিতৃপ্ত করে এবং ফুলে ও ফসলে পরিপূর্ণ করে তোলে।

বর্ষার শ্যামল সৌন্দর্য ও আবেগের সাথে অন্য কোনো ঋতুর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সজীবতা, বৈচিত্র্য ও বিস্ময়ে বর্ষা এক অনন্য ঋতু। বর্ষার অকৃত্রিম ঔদার্য বাংলাদেশের প্রকৃতিকে এক নতুন সৌন্দর্য দান করে। এসময় প্রাণরসে সজীব হয়ে ওঠে বৃক্ষলতা। বিলগুলো শাপলার হাসিতে ভরে ওঠে। এসময় গাছে গাছে ফোটে কদম ফুল। ফোটে জুঁই, চাঁপা, কেয়া, টগর, বেলি, হাসনাহেনা ও চামেলী। শাকসবজির মধ্যে শসা, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙা, করলা এবং পুঁইশাক উৎপাদিত হয় অনেক। নদীনালা, খালবিল পানিতে ভরা থাকার কারণে প্রচুর মাছও পাওয়া যায়। বিশেষ করে ইলিশের মৌসুম বর্ষাকাল। বর্ষার কারণে বাংলাদেশ 'ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা'। বর্ষার নদী বাহিত পলি মাটি এদেশের ফসলের মাঠকে উর্বর করে তোলে এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বর্ষার জলধারা সারা বছরের পুঞ্জিভূত আবর্জনা ধুয়ে-মুছে প্রকৃতিকে পরিশুদ্ধ করে তোলে।

বর্ষা বাঙালির মনকে সরস ও কাব্যময় করে। এর মেঘমেদুর আবহাওয়া, বৃষ্টির অবিরল ধারা, টাপুর-টুপুর শব্দ মানুষের মনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তখন মানুষ হারানো অতীতকে রোমন্থন করে আনন্দ পায়। অতীত দিনের স্মৃতিগুলো একের পর এক ভেসে ওঠে মানসপটে। উদাস দৃষ্টিতে জলপতনের দৃশ্য দেখে বিমোহিত হয় মন। জানালার পাশে বসে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের তালে তালে গান গাওয়া– এ এক অনন্য ভালোলাগা। বর্ষা কবি মনকে করে আন্দোলিত। তারা নানা গান ও কবিতায় বর্ষার রূপ, সৌন্দর্য ও প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন নানাভাবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বর্ষা' সম্পর্কে লিখেছেন–

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হলো সারা,
নদী ভরা ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন–

আদর গরগর বাদল দরদর
এ তনু ডরডর কাঁপিছে থরথর
নয়ন ঢলঢল কাজল কালো জল
ঝরে লো ঝর ঝর।

কবি জসীমউদ্দীন লিখেছেন–

এদিকে দিগন্তে যতদূর চাহিয়া, পাংশু মেঘের জাল,
পায়ে জড়াইয়া পথে দাঁড়ায়েছে আজিকার মহাকাল।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন–

গ্রীষ্ম নিঃশেষ! জাগছে আশ্বাস
লাগছে গায়িকার গৈরি নিঃশ্বাস।

বর্ষাকাল সৌন্দর্যে, দাক্ষিণ্যে এবং প্রভাবে তুলনাহীন। নানা উপকারের পাশাপাশি বর্ষা আমাদের জন্য কিছু বিপর্যয় ডেকে আনে। এসময় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত নানা উপকার করে থাকলেও অতিবৃষ্টি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। জনজীবন চরম দুর্ভোগের মুখোমুখী হয়। রাস্তাঘাট জলমগ্ন থাকে, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির প্রাণনাশ ঘটে, নানা প্রকার রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। তারপরও বর্ষা বাংলাদেশের এক অনবদ্য ঋতু। বাংলাদেশের যে অপরূপ প্রাকৃতিক নিসর্গ তা বর্ষারই অবদান। বর্ষা ঋতু চিরকালই আবেগে, আনন্দে ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ও অনন্য।

লেখক: প্রাবন্ধিক

করোনার দিনকাল

মো. সাঈদ হোসেন

করোনাতে মরছে মানুষ
করছে আহাজারি।
সব দেশেতেই এই সমস্যা
মানতে নাহি পারি।
লকডাউনে ঘরে থাকি
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি
করোনা থেকে মুক্তি
জীবনে আসুক স্বস্তি
আশাতে মন বাঁধি
মনের শক্তিতে ভর করি
সামনের পথে এগিয়ে চলি।

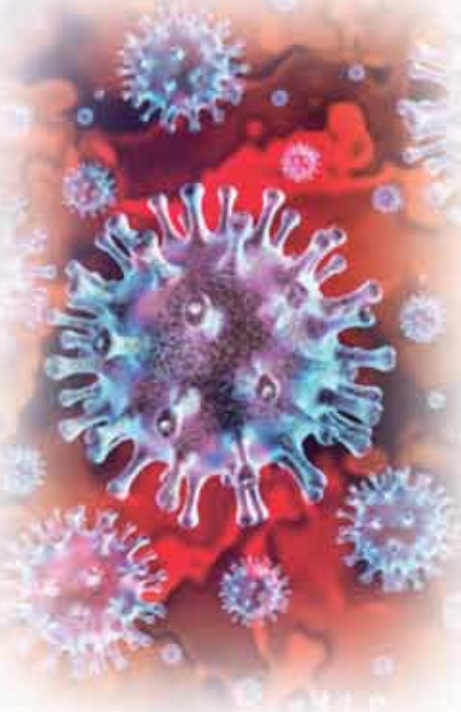

বিদায় এই নগরী

ইফফাত রেজা

সময় পেঁচিয়ে যায়
সেঁধিয়ে যায় কার ভেতর?
জানি শুনলে কেউ ভেবে নেবে মাথাটি গেল?
নিঃশব্দতার ভেতর ঘড়ির আওয়াজ কানে বাজে
ঘরবন্দি মানুষ ধৈর্য হারাচ্ছে
মেজাজ শুনে বুঝতে পারি সহধর্মিণীর দিকে
তাকানো নিষ্প্রয়োজন
তবু একদিন টিএন্ডটি লাইনে টেলিফোন বেজে ওঠে
পারমাণবিক যুদ্ধের মধ্যে প্রথম ফোন!
একজন হলেও কেউ দরদি আছে!
হ্যাঁ এক বন্ধু তিনি...
কোনো মতে একবার শুধু হ্যালো বলতেই পারি
আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল কণ্ঠ।

খুঁজে বেড়াই

অপূর্ব বিক্রমাদিত্য

আমি আজও খুঁজে বেড়াই
আমার অতীত শৈশব,
কেন জানি জীবনটা নির্দয়
গোলকধাঁধার মতোই আজব।
আমি আজও খুঁজে বেড়াই
মৃত্তিকার গহীন শীর্ষ,
চন্দ্র তারার জ্যোৎস্না আলোর
গহীন মায়াবী দৃশ্য।
আমি আজও খুঁজে বেড়াই
যান্ত্রিক জীবনের ইতি,
যন্ত্রণার মাঝে বেঁচে থাকাই
মানব সমাজের নীতি।

করোনায় ক্লান্ত

মো. নূরে আলম

থাকছি ঘরে
যাচ্ছিলাম চড়ে
ব্যস্ততায় সময় কাটাচ্ছি–
হঠাৎ এসেছিল করোনা,
বলেছিলাম সরে যাও, সরে না।
বলতে বলতে এখন আমি ক্লান্ত,
তবু এখনো হয়নি ক্ষান্ত।
আবার চাচ্ছি চড়তে,
এখন পারছি না ঘরেও ফিরতে।
হে প্রভু!
কেউ নেই, তুমি আছ
তোমায় বলছি তবুও
আবার ফিরিয়ে দাও
আমার ঘর!
ফিরিয়ে দাও
আমার সেই চরাচর।

প্রকৃতি

রানা হোসেন

এই প্রকৃতি তোমার ভালোবাসা
আমরা সিক্ত হচ্ছি
তোমার রূপে সবুজ ফসলে
নানান পাখি উড়ছে।
নদীকূলে গাছের ছায়ায়
কিশোর দুরন্তবেলা
আমের মুকুল কখনো খেঁজুর রসে
কাদা জলের খেলা।
পেয়ারা আর জামের গাছে
বৃষ্টি ঝড়ত কত
সেই বৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ানো
পাড়ার বন্ধু যত।
তোমার বুকে এদেশ দেখা
বাঁচতে ইচ্ছে হয়
তোমার প্রকৃতি সবুজ শ্যামল
মনটা পড়ে রয়।
তুমি আমার সূর্য হাসি
আর হাজার অভিমান
এই নদী এই গ্রাম
খোদা তোমারি দান।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাপন

সোহেল আহমেদ

বাংলাদেশে বসবাসকারীদের অধিকাংশই বাঙালি জাতি হলেও এই দেশের সমতলে ও পাহাড়ে ছড়িয়ে আছে বহু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী, যাদের রয়েছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারা। তাদের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস সবকিছুতেই রয়েছে ভিন্নতা। পার্বত্য অঞ্চলে ১১টি জাতিসত্তা অতীতকাল থেকে বসবাস করছে। এরা হচ্ছে– চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গা, বম, পাংখোয়া, চাক, খ্যা, খুমি এবং লুসাই। বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের বৃহত্তর ময়মনসিংহে রয়েছে– গারো, হাজং, কোচ এবং বৃহত্তর সিলেটে রয়েছে– খাসিয়া, পাত্র ও মণিপুরি জনগোষ্ঠী। আবার বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি এলাকায়ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। যেমন: সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহালি, মালো, মুন্ডা, মালপাহাড়ি ইত্যাদি। এছাড়াও দেশের দক্ষিণ–পূর্বাংশে কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় বসবাস করেন রাখাইন জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে যেমন– রাজবংশী, সূর্যবংশী, বর্মণ, ডালু, হদি, মাহাতো, বানাই, পাথর, কেলে ইত্যাদি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে বলে জানা যায়। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে, বাংলাদেশে ৫৫টির অধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে, এদের মোট জনসংখ্যা ৩০ লাখেরও অধিক। স্বল্প পরিসরে বাংলাদেশের বসবাসকারী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

চাকমা

বাংলাদেশের প্রধান ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতি 'চাকমা'। এরা চাংমা নামেও পরিচিত। চাকমারা মঙ্গোলীয় জাতির একটি শাখা। বর্তমান মিয়ানমারের আরাকানে বসবাসকারী ডাইংনেট জাতিগোষ্ঠীকে চাকমাদের একটি শাখা হিসেবে গণ্য করা হয়। এরা প্রধানত থেরাবাদ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বৌদ্ধ পূর্ণিমা ছাড়া তাদের অন্যতম প্রধান আনন্দ উৎসব হচ্ছে বিজু। বাংলাদেশের রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে এদের সংখ্যা বেশি। তবে বান্দরবানেও চাকমাদের উপস্থিতি রয়েছে। চাকমাদের ভাষার নামও চাকমা (চাংমা)। চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। চাকমারা ৪৬টি গোজা ও বিভিন্ন গুত্তি বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের সংখ্যা ৪ লাখ ৪৪ হাজার ৭৪৮ জন।

মারমা

মারমা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তা। তিন পার্বত্য জেলায় তাদের বসবাস দেখা গেলেও মূল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের বসবাস বান্দরবানে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমারা মিয়ানমার থেকে এসেছে বিধায় তাদের 'ম্রাইমা' নাম থেকে নিজেদের 'মারমা' নামে ভূষিত করে। মারমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কথা বলার ক্ষেত্রে মারমাদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও লেখার ক্ষেত্রে তারা বার্মিজ বর্ণমালা ব্যবহার করে। মারমা সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পুরুষদের মতো মেয়েরাও পৈতৃক সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকারী হয়। ভাত মারমাদের প্রধান খাদ্য। পাংখুং, জাইকা, কাপ্যা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মারমা সমাজে জনপ্রিয়। সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মারমাদের সংখ্যা ২ লাখ ২ হাজার ৯৭৪ জন।

সাঁওতাল

সাঁওতাল বা মান্দি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম। এরা দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে বাস করে। ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে সাঁওতালরা বাংলাদেশের অন্য নৃগোষ্ঠীর মতো মঙ্গোলীয় গোত্রের নয়। সাঁওতালরা যে ভাষায় কথা বলে সেটি অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভাত সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য। মাছ, কাঁকড়া, শুকর, মুরগি, বন জঙ্গলের পশুপাখি, খরগোশ, গুইসাপ, ইঁদুর, বেঁজির মাংস এদের প্রিয় খাবার। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী এদের সংখ্যা ১ লাখ ৪৭ হাজার ১১২ জন।

ত্রিপুরা

বাংলাদেশের আরেকটি নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায় 'ত্রিপুরা'। এদের জনসংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭৮৯ জন। ত্রিপুরাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। ছেলেরাই সম্পত্তির অধিকারী হয়। তারা মঙ্গোলীয় মহাজাতির অংশ। কাপড় তৈরিতে এদের বেশ দক্ষতা রয়েছে।

গারো

বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায় হলো 'গারো'। ময়মনসিংহ ছাড়াও টাঙ্গাইল, সিলেট, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঢাকা ও গাজীপুর জেলায় গারোরা বাস করে। গারোরা ভাষা অনুযায়ী

বোডো মঙ্গোলীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে অনেক গারোই নিজেদের মান্দি বলে পরিচয় দেন। গারোদের সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত।

হাজং

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে বসবাসরত একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো 'হাজং'। বাংলাদেশে এদের বাস নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা ও

দুর্গাপুর উপজেলায় এবং শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী উপজেলায়। হাজংরা প্রধানত ধান চাষি। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এরা খুব দাপটের সাথে বসবাস করেছে এবং ঐতিহাসিক হাজং বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, টঙ্ক আন্দোলন ইত্যাদির নেতৃত্বে এদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

খাসিয়া

বাংলাদেশের সিলেট জেলায় 'খাসিয়া' জনগোষ্ঠী বাস করে। সিলেটের খাসিয়ারা সিনতেং গোত্রভুক্ত জাতি। এরা কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ভাত ও মাছ তাদের প্রধান খাদ্য। খাসিয়া সমাজব্যবস্থা মাতৃপ্রধান। তাদের মধ্যে কাঁচা সুপারি ও পান খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি। খাসিয়াদের উৎপাদিত পান বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। এ সম্প্রদায়ের লোকজন শান্তিপ্রিয়।

মণিপুরি

বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় 'মণিপুরি' সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। এদের আদি নিবাস ভারতের মণিপুর রাজ্যে। মণিপুরিদের নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে।

তঞ্চঙ্গা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে 'তঞ্চঙ্গা' ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যার দিক থেকে এদের স্থান পঞ্চম। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এদের জনসংখ্যা ৪৪ হাজার ২৪৫ জন। নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় তঞ্চঙ্গারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। এরা পালি, প্রাকৃত, আদিবাংলা ভাষায় কথা বলে। এদের স্বভাব বেশ নম্র। এরা কিছুটা লাজুক স্বভাবের হয়।

বম

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম 'বম'। বম জাতি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। 'বম' শব্দের অর্থ হলো বন্ধন। বান্দরবান জেলার রুমা, থানচি, রৌয়াংছড়ি ও সদর থানা এবং রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি থানায় মোট ৭০টি গ্রামে বম জাতির বসবাস। বমদের সঙ্গে বাংলাদেশের মূলস্রোতের মানুষের যোগাযোগ ও জানাশোনা অতি সামান্যই।

চক

বাংলাদেশের বান্দরবান, চট্টগ্রামের চক পাহাড় ও মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে 'চক' জাতির বসবাস। চকরা যে ভাষায় কথা বলে সেটি চাক ভাষা নামে পরিচিত। চকদের ভাষায় 'চক' শব্দের অর্থ 'দাঁড়ানো'। চকরা নিজেদের শেষে চক লিখলেও আরাকানিরা চকদের 'সাক' এবং কখনো 'মিঙচাক' বলে ডাকে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে চকদের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার ৮৩৫ জন।

খুমি

বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার রুমা, রৌয়াংছড়ি এবং থানচি উপজেলাতে বসবাসরত একটি নৃগোষ্ঠী হলো 'খুমি'। এরা খামি নামেও পরিচিত। ১৭ শতকের শেষভাগে খুমি উপজাতি আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করে। গোষ্ঠীগত দাঙ্গার কারণে খুমিদের একটি অংশ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে বান্দরবানে বসবাস করতে শুরু করে। তারা সাধারণত প্রকৃতি পূজারি। জুম চাষই তাদের প্রধান জীবিকা। এদের মোট জনসংখ্যা ৩ হাজার ৩৬৯ জন।

লুসাই

বাংলাদেশের পূর্বে বসবাসকারী একটি জাতি 'লুসাই'। এরা নিজেদের মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বংশধর বলে পরিচয় দেয়। তাদের

অধিকাংশই পাহাড়ে জুম চাষ করে। লুসাই পাহাড়ের নামেই তাদের নামকরণ হয়েছে– লুসাইদের চাকমারা কুগী, মারমারা লাঙ্গী ও ত্রিপুরারা শিকাম নামে অভিহিত করে।

কোচ

বাংলাদেশে বসবাসকারী অন্যতম প্রাচীন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী 'কোচ'। বর্তমানে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী, নালিতাবাড়ী এবং শ্রীবর্দী উপজেলায় তাদের বসবাস। কোচ ও রাজবংশীদের প্রায় সময়ই একই জাতি মনে করা হয়। কোচদের প্রধান খাদ্য ভাত। কোচরা একদিকে যেমন দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা সম্পন্ন করে তেমনি আদি ধর্মের দেবদেবীরও পূজা করে।

রাখাইন

বাংলাদেশের আরেকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম 'রাখাইন'। এরা মগ নামেও পরিচিত। আঠারো শতকের শেষে এরা আরাকান থেকে বাংলাদেশে এসে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে রাখাইন সম্প্রদায়ের বসবাস মূলত কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায়। এছাড়া রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু রাখাইন বসতি দেখা যায়। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায়ও রাখাইন সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে।

ওঁরাও

দক্ষিণ এশিয়ার একটি বড়ো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী 'ওঁরাও'। বাংলাদেশেও এদের বসবাস রয়েছে। তারা কুরুখ ভাষায় কথা বলে। তাদেরকে কুরুখ জাতিও বলা হয়। এটি দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

মুন্ডা

বাংলাদেশে বসবাসরত আরেকটি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতি হলো 'মুন্ডা'। মুন্ডা জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে তার নাম মুন্ডারি। এরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মুন্ডাদের বিশেষ পছন্দের খাদ্য হচ্ছে– কাঁকড়া, ইঁদুর ও শামুক।

কন্দ

'কন্দ' হলো বাংলাদেশে বসবাসকারী একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে কন্দ জাতি বসবাস শুরু করে। বর্তমানে কন্দরা উড়িয়া ভাষায় কথা বলে।

পাংখোয়া

বাংলাদেশের বসবাসকারী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম 'পাংখোয়া'। চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলার রাঙামাটিতে এরা বসবাস করে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে বসবাসকারী পাংখোয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার।

মুরং

বাংলাদেশের একটি নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী 'মুরং'। মুরং শব্দটি বহুবচন যার একবচন হলো 'ম্রো'। 'ম্রো' শব্দের অর্থ মানুষ। ম্রো ভাষায় মুরংরা নিজেদের 'মারুচা' বলে থাকে। মুরংদের ভাষা মৌখিক। মুরংরা অত্যন্ত স্বল্পবসন পরিধান করে। মুরং সম্প্রদায় মূলত প্রকৃতি পূজারি।

রাজবংশী

রাজবংশী বা কোচ রাজবংশী বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে। কিছু সংখ্যক এই গোষ্ঠীর লোকেরা বগুড়া ও ময়মনসিংহ জেলাতেও আছে। রাজবংশীরা খর্বকায়, লম্বা, চ্যাপটা ও তীক্ষ্ণ নাক, উঁচু চোয়ালবিশিষ্ট এক মিশ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ। এরা প্রধানত শিবভক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং পিতৃপ্রধান পরিবার।

এছাড়াও বাংলাদেশের খেয়াং, ডালু, উসাই, মং, বর্ম্মন, পাহাড়ি, মালপাহাড়ি, কোল, পাংগোন, পাত্র, গণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যক্রম সম্পন্ন করছে। যেমন: শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, সাংস্কৃতিক খাতে নানা ধরনের উন্নয়নমুখী কার্যক্রম– যা তাদের জীবনমান উন্নত করেছে। বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়ায় তাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বজ্রপাতঃ কারণ ও প্রতিকার

মিঞ্জু মান্নান

প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বাংলাদেশ। ঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প এদেশের মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে বজ্রপাত প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এপ্রিল, মে, জুন মাসে সাধারণত বজ্রপাত বেশি হয়ে থাকে। সারা বছরের মধ্যে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি থাকে, ফলে এ সময়ে বজ্রপাতের সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি বেশি তৈরি হয়।

'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম'

বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অবহেলা নয় সময় দিন

পিআইডি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। গত ৫০ বছরে দেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার দশমিক পাঁচ শতাংশ (আবহাওয়া অধিদপ্তর), তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বজ্রপাত তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞ। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেও বাংলাদেশে এই দুর্যোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগর আর উত্তরে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। ফলে উষ্ণ ও ঠাণ্ডা বাতাসের সংমিশ্রণ ঘটছে যা বজ্রপাতের পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ভূমিকম্পের মতো বজ্রপাতের পূর্বাভাসও আগে থেকে জানা যায় না, ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে দিন দিন। বজ্রপাতে বাংলাদেশে কৃষকরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন কারণ তারা খোলা মাঠে কাজ করে থাকেন। তালগাছসহ বড়ো বড়ো গাছ কেটে ফেলার কারণেও বজ্রপাত হচ্ছে। কারণ এই গাছগুলো বজ্র নিরোধক হিসেবে কাজ করে।

২০১৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিন দশকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, নব্বইয়ের দশকে প্রতিবছর গড়ে ৩০ জন, পরবর্তী দশকে গড়ে ১১৬ জন মারা যায়। আর বিগত দশকে (২০১০-২০১৮) মৃত্যুর পরিমাণ ছিল বছরে ২৪৯ জন।

বজ্রপাতে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে বজ্রপাতকে 'দুর্যোগ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করে Lightning Detection System অনুসারে সর্বত্র এই কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানোর লক্ষ্যে দেশবাসীকে আগাম সতর্কবার্তা দিতে দেশের ৮টি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে বজ্রপাত চিহ্নিতকরণ যন্ত্র বা লাইটনিং ডিটেকটিভ সেন্সর বসিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। ঢাকায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ছাড়াও ময়মনসিংহ, সিলেট, পঞ্চগড়, নওগাঁ, খুলনা, পটুয়াখালী এবং চট্টগ্রামে এই সেন্সর বসানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আটটি ডিটেকটিভ সেন্সরের যন্ত্রপাতি কেনায় ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা। বজ্রপাতের প্রভাব হ্রাসে দেশব্যাপী তালগাছ রোপণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৮ লাখ তালগাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে কিছু করণীয় অবশ্যই মেনে চলা উচিত, যা নিম্নরূপ:

১. বজ্রপাত সাধারণত ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করা।

২. গভীর ও উল্লম্ব মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাইরে বের না হওয়া; অতি জরুরি অবস্থায় রাবারের জুতা পরে বাইরে যাওয়া।

৩. বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা বা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে না থাকা।

৪. বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেতে বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়া।

৫. বজ্রপাতের আশঙ্কা হলে যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নেওয়া।

৬. বজ্রপাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা।

৭. উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার, ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।

৮. গভীর ও উল্লম্ব মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকা।

৯. বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ না রাখা। সম্ভব হলে কোনো কংক্রিটের নিচে আশ্রয় নেওয়া।

১০. বজ্রপাত চলাকালে বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় না থাকা। জানালা বন্ধ রাখা এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকা।

১১. বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার না করা। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা।

১২. বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখা এবং নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা।

১৩. বজ্রপাতের সময় ছাউনিহীন নৌকায় মাছ ধরতে না যাওয়া, সমুদ্র বা নদীতে থাকলেও মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করা।

১৪. বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ না করা।

১৫. প্রতিটি বিল্ডিং-এ বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করা।

১৬. খোলা স্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে একত্রে না থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

১৭. কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত বজ্রপাত নিরোধক ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে থাকা।

১৮. বজ্রপাতের সময় মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, টিভি, ফ্রিজসহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সুইচ বন্ধ রাখা এবং বজ্রপাতের আভাস পেলে আগেই এগুলোর প্লাগ বিচ্ছিন্ন করা।

১৯. বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসা করা, দ্রুত চিকিৎসককে ডাকা বা হাসপাতালে নেওয়া।

২০. বজ্রপাতে আহত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া।

বজ্রপাত থেকে ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত জরুরি। যেমন:

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট Stakeholder-দের নিয়ে পরিপূর্ণ আইনি কাঠামো গঠন ও বিধিমালা প্রণয়ন।

২. বজ্রপাতে ক্ষতিহ্রাস করণীয় বিষয়ে নির্দেশিকা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩. বজ্রপাত নিরাপদ শেড তৈরি।

৪. বজ্রপাতের সতর্কবার্তা পাওয়ার ব্যবস্থা ও জনগণকে অবহিতকরণ।

৫. বজ্রপাত বিষয়ক সেল তৈরি করা।

৬. Early warning system সংক্রান্ত উন্নত গবেষণা।

৭. পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তি।

৮. জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে বিষয়টির তাৎপর্য তুলে ধরা।

৯. খোলা মাঠে উঁচু জাতের গাছ লাগানো (যেমন: তাল, খেজুর, সুপারি, নারকেল ইত্যাদি)।

১০. বিল্ডিং কোডে লাইটিং বিষয়ে নির্দেশ বাস্তবায়নে নির্দেশনা।

১১. বজ্রপাত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

১২. বজ্রপাত সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে প্রচারণা।

১৩. বজ্রপাতের সময় বা পরে যে ধরনের মানসিক সমস্যা (Post Traumatic Stress Disorder) হয় তা নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৪. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)-এ বজ্রপাত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

১৫. Sectoral plan-এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ।

১৬. বজ্রপাত ঝুঁকি মোকাবিলায় কৌশলপত্র প্রণয়ন ইত্যাদি।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী বিমান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী কার্যক্রমের ইতিহাসে

বাংলাদেশের জাতীয় পাতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট চার্টার্ড জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী কার্যক্রমের ইতিহাসে এই প্রথমবারে মতো শান্তিরক্ষীদের বহন করেছে। এই ফ্লাইটে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে নিযুক্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) মিনুসকা মিশনে যোগ দিবেন। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অমূল্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী পরিবহণে দেশটির নিজস্ব বিমান চার্টার্ড করল জাতিসংঘ। এটি একটি মাইলফলক।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন জাতিসংঘ সদর দফতরের সঙ্গে বিমান চার্টার্ড সংক্রান্ত এই চুক্তি স্বাক্ষর, সার্বিক সমন্বয় ও নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি (প্রেস) নূর এলাহী মিনা জানান, এই কন্টিনজেন্টের মধ্যে রয়েছে আর্মড ইউটিলিটি হেলিকপ্টার ইউনিটের ১২৫ জন সদস্য, কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স কোম্পানির অগ্রবর্তী দলের ২০ জন সদস্য এবং কোভিড-১৯ এর কারণে আটকে পড়া মিনুসকা (MINUSCA) মিশনের ৩৪ জন শান্তিরক্ষী। ফ্লাইটটি ২৯শে মে সকালে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বাঙ্গুইতে পৌঁছায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে ৬৫৪৩ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বিশ্বের ৯টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে কর্মরত রয়েছেন যার মধ্যে ১০৬১ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের (MINUSCA) মিনুসকা মিশনে দায়িত্ব পালন করছেন। জাতিসংঘের এই শান্তিরক্ষা মিশনটি ২০১৪ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে কাজ শুরু করে।

প্রতিবেদন: হাসনাত হোসেন

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে বাংলাদেশ

জেসিকা হোসেন

মাদকদ্রব্য হলো এমন এক প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক দ্রব্য যা শরীর বা মনের ওপর নির্ভরশীলতা বা আসক্তি সৃষ্টি করে। এই দ্রব্য কয়েকবার গ্রহণ করার পর বার বার গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে। চিকিৎসকরা বলেন, মাদক সেবন বন্ধ করলেই শরীরে নানারকম প্রতিক্রিয়া ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। এর ক্রমাগত গ্রহণে শরীরে এর চাহিদা বাড়তেই থাকে। আমাদের দেশে প্রচলিত মাদকদ্রব্যগুলো হলো– ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা, আফিম, মরফিন, প্যাথেডিন, টিডিজেসিক ইনজেকশন, গাঁজা, ভাং, মদ, তাড়ি, ঘুমের ঔষধ ইত্যাদি।

মাদক থেকে মাদকাসক্তির পরিণাম ভয়াবহ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ড্রাগ হলো এমন বস্তু যা গ্রহণ করলে ব্যক্তির এক বা একাধিক কার্যকলাপের পরিবর্তন ঘটায়। একটা ড্রাগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার রাসায়নিক গঠন বৈশিষ্ট্যের ওপর। এ ড্রাগ অপব্যবহারের কারণে রোগী তার রোগের জন্য ওষুধের গুণাগুণ পাওয়ার বদলে পায় বিষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ অপব্যবহারের মাধ্যমে মাদকাসক্তির সূচনা হয়। অপব্যবহার থেকে অভ্যাস। অভ্যাস থেকে আসক্তি।

মাদকাসক্তির প্রধান শিকার তরুণ ও যুবসমাজ। নেশার কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ তরুণশক্তি মেধা ও সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে, যা যে-কোনো দেশ ও জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের দায়িত্বশীল আচরণ, যত্ন, সহানুভূতি এবং ধর্মীয় অনুশাসন মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে পারে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বর্তমানে একটি বৈশ্বিক সমস্যা। মাদকের চোরাচালান ও অপব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা ও দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ২৬শে জুন দিনটিকে মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই থেকে দিনটি পালিত হয়

'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' হিসেবে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। এ দিবস উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ক্রোড়পত্র, সুভ্যেনির প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া র‍্যালি, আলোচনাসভা, মাদক রোধে গণমাধ্যম ও মুঠো ফোনে মেসেজ পাঠানো হয়। বাংলাদেশ সরকার মাদকের করাল গ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে এ সংক্রান্ত আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করেছে। মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আর বর্তমানে মাদকের কুফল সম্পর্কে জানিয়ে দিতে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার শুরু করেছে। এর মাধ্যমে শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করানো হয়। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার সমস্যার সমাধানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, পিতা-মাতা, অভিভাবকসহ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার এখন জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা, ২০৪০ সালের মধ্যে দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে তামাক শতভাগ নির্মূল করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সরকার জনস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ সংশোধন করেছে এবং ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। এতে তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরনের প্রচার-প্রচারণা এবং শিশুদের তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ১৮ বছরের নিচের শিশুদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তামাক ও ধূমপান সংক্রান্ত এসকল আইন ও বিধি-বিধানের সঠিক প্রতিপালন নিশ্চিত করতে দরকার সকলের সমান চেষ্টা। সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে মাদকমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য স্ব স্ব অবস্থানে থেকে সবাইকে কাজ করে যেতে হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও রেমিট্যান্সে নতুন রেকর্ড

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৪ দশমিক ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রির্জাভের পরিমাণ ৩৪ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করল। যে-কোনো সময়ের তুলনায় কোনো আর্থিক বছরের এই সময় ৩রা জুন পর্যন্ত এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভের ইতিহাস। গত অর্থবছরে ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে যা ছিল ৩৩ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এ বছরে অর্থবছরের এক মাস বাকি রিজার্ভ ৩৪ দশমিক ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই রেকর্ড অর্জন হলো। দেশে প্রথমবারের মতো রিজার্ভ ৩৩ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করেছিল ২০১৭ সালে। পাশাপাশি, এ অর্থবছরের একই তারিখ অর্থাৎ ৩রা জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স অর্জন করেছে। এটাও যে-কোনো অর্থবছরের তুলনায় সর্বোচ্চ রেকর্ড। এ সময়ে বাংলাদেশ অর্জন করেছে ১৬ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা সরকারের দুই শতাংশ প্রণোদনা প্রকল্পের সুফল হিসেবে দেখা দিয়েছে। গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে যা ছিল ১৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ খাতেও এ অর্থবছরের এক মাস বাকি থাকতেই ১৬ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই রেকর্ড অর্জন হয়েছে।

সূত্র: পিআইডি

নিবন্ধ

রক্তদানের গুরুত্ব

মো. ইসফাক কাদের

১৪ই জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। অগণিত মুমূর্ষু রোগীকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে যারা মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেন, তাদের অবদানের মূল্যায়ন, স্বীকৃতি ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিশ্বজুড়ে এ দিবস পালন করা হয়। মানুষকে প্রাণঘাতী রক্তবাহিত রোগ– এইডস, হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি সহ অন্যান্য রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদান ও রক্তের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সাধারণ মানুষকে রক্তদানে উৎসাহিত করাই এ দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

১৯৯৫ সাল থেকে 'আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস' পালন এবং ২০০০ সালে 'নিরাপদ রক্ত'– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালে প্রথম রক্তদান দিবস পালিত হয়। ২০০৫ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিবেশনের পর প্রতিবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (ডব্লিউএইচও) এ দিবসটি পালন করে আসছে। প্রতিবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিবসটির একটা প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয়– 'Give blood and make the world a healthier place'। রক্তের গ্রুপের আবিষ্কারক কার্ল

ল্যান্ডস্টেইনার-এর জন্মদিন ১৪ই জুন ১৮৬৮। তাঁর স্মরণে ২০০৪ সাল থেকে এ দিবসকে 'বিশ্ব রক্তদাতা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, প্রতিবছর ১০৭ কোটি ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। যার মধ্যে ৩১ শতাংশ স্বেচ্ছায় রক্তদাতা আর ৫৯ শতাংশ আত্মীয় রক্তদাতা। বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে শতভাগ স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। উন্নত বিশ্বে রক্তদানের হার প্রতি হাজারে ৪০ জন আর উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি হাজারে ৪ জনেরও কম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের জনগোষ্ঠীর ২য় শতাংশ লোক বছরে একবার করে রক্তদান করলে আমাদের দেশে রক্তের অভাব হবে না। বর্তমানে বাংলাদেশে চাহিদার শতভাগ স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে রক্তদানকারী মানুষের উদ্দেশ্যে ১৪ই জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস হিসেবে উৎসর্গ করা হয়।

করোনাকালে রক্তদানে যেসব বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে তা হলো– ১. রক্তদাতা এবং ব্লাডব্যাংকের কর্মীদের ফেস মাস্ক, সার্জিক্যাল পরতে হবে, ২. তাপমাত্রা মেপে দেখা বাধ্যতামূলক, ৩. ৬০ শতাংশ অ্যালকোহল রয়েছে এমন স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে, ৪. সমস্ত উপকরণ এবং বেড জীবাণুমুক্ত করতে হবে, ৫. ৬ ফুটের শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, ৬. কোনো কোভিড-১৯ উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিকে শিবিরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। আয়োজক এবং রক্ত সংগ্রহকারীদের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য জারি করা সমস্ত স্বাস্থ্যসুরক্ষা বিধি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে।

রক্ত সম্পর্কিত নানা বিষয়ে জানতে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা পেতে স্বাস্থ্য বাতায়নে ১৬২৬৩ নম্বরে কল করুন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

পথিকৃৎ চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ১২২ বছর

আপন চৌধুরী

চলচ্চিত্র বিজ্ঞানের অবিরত দৃষ্টিতত্ত্ব। যখন আমরা একটা জিনিস দেখি এবং তা থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্য আরেকটা জিনিস দেখি, এই দুইয়ের মাঝে আমাদের চোখে খুব সামান্য সময়ের জন্য হলেও (সেকেন্ডের ভগ্নাংশ) আগের দেখার চিত্রটার রেশ লেগে থাকে। চলচ্চিত্রে পর পর সাজানো একটা শট থেকে আরেকটা শটে দর্শককে টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টির বিজ্ঞানগত ভিত্তিটা হচ্ছে এই অবিরত দৃষ্টিতত্ত্ব। চলচ্চিত্রের ক্ষুদ্রতম উপাদান ফ্রেম/ইমেজ। ইমেজ বা চিত্র আলোর ওপর নির্ভরশীল। প্রাচীন গুহাচিত্র, ধোঁয়া সংকেত, চীনা ছায়া নাটক, মধ্যযুগের ম্যাজিক লণ্ঠনের মাঝে দেখা যায় মানুষ কীভাবে ঘটমান গতিকে রূপ দিতে চেয়েছেন।

বহু বিজ্ঞানীর সাধনার ফল চলচ্চিত্র আবিষ্কার। আমেরিকান বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসনকে আধুনিক চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়ে থাকে। সপ্তকলার সমন্বয়ে গঠিত চলচ্চিত্র একটি যৌগিক শিল্প হলেও আধুনিক জগতে জনপ্রিয় গণমাধ্যম হিসেবে একটি আলাদা শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এখানেই চলচ্চিত্রের সার্থকতা।

অগাস্ত লুমিয়ের (১৮৬২-১৯৫৪) ও লুই লুমিয়ের (১৮৬৪-১৯৪৮) নামে দুই ভাই সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের হোটেল গ্রান্ড ডি ক্যাফেতে সর্বপ্রথম জনসম্মুখে বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এগুলো ছিল সব এক শটের চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র আবিষ্কারের প্রথম যুগে সচল ছবি/ চিত্র প্রদর্শনের যন্ত্রকে বলা হতো কিনেটোস্কোপ বা বায়োস্কোপ। বায়োস্কোপ পরে মোশন পিকচার বা চলচ্চিত্র বলে আখ্যায়িত হয়।

গ্রিক শব্দ 'কিনেমা' থেকে সিনেমা শব্দের উৎপত্তি। যার বাংলা অর্থ হলো চলচ্চিত্র। কিনেমা/ সিনেমা/ চলচ্চিত্রের মূলকথা গতি বা মুভ করা। সেখান থেকেই মুভি। ফিল্মের মাধ্যমে হয় বলেই এটাকে ফিল্ম বা ছবি কিংবা পিকচার। চলমান চিত্র তথা মোশন পিকচার বা মুভি থেকে চলচ্চিত্র শব্দটি এসেছে।

উপমহাদেশের তথা বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেনের জন্ম তৎকালীন ঢাকার মানিকগঞ্জের বগজুরি গ্রামে বৈদ্য বংশে ১৮৬৮ সালে আগস্ট মাসে। তাঁর পিতা চন্দ্রমোহন সেন প্রথমে ঢাকা জেলা কোর্ট ও পরে কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। তাঁর মাতার নাম বিধুমুখী দেবী। হীরালালের প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু হয় মানিকগঞ্জ ও ঢাকায়। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা গিয়ে আইএ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর লুমিয়ের ভাইদ্বয় ফ্রান্সে বাণিজ্যিকভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন শুরু করার পর তারা সারা বিশ্বে এজেন্টের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। তাদের প্রতিনিধি মরিস সেসতিয়া অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পথে বোম্বে যাত্রা বিরতিকালে ওয়াটসন হোটেলে ১৮৯৬ সালের ৭ই জুলাই চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এটি ছিল ভারতে চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী। ওখানে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলো হলো- এন্ট্রি অব সিনেমাটোগ্রাফ, অ্যারাইভাল অব অ্যা ট্রেন, স্ট্রিট ড্যানসেস অব লন্ডন, হোসপাইপ ইন দ্য গার্ডেন ইত্যাদি। এটা চলে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত। কলকাতায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়

১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে। এখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন স্টিফেনস নামে এক ব্যক্তি। ফটোগ্রাফিতে সাতবারের স্বর্ণপদক জয়ী আলোকচিত্রী শিল্পী হীরালাল সেন স্টিফেনস কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি স্টিফেনসের কাছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চান। কিন্তু তিনি হীরালালকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেননি। ঐ সময় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার ল্যাঁফো ক্লাসে ছাত্রদের কাছে ঘরোয়াভাবে বায়োস্কোপ প্রদর্শন করেন। হীরালাল তার কাছে গেলে তিনি কৌশল রপ্ত করতে সাহায্য করেন। হীরালাল আই.এস.সি অধ্যয়নকালে এর প্রতি আকৃষ্ট হন। পড়াশুনা ত্যাগ করে বায়োস্কোপ অনুশীলন করেন।

এরপর ১৮৯৮ সালে হীরালাল সেন রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি গঠন করে বিদেশ থেকে বায়োস্কোপ প্রদর্শনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। এরপর পূর্ব ভারতের সেকালের রাজা, মহারাজা, জমিদার ও পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের অনুষ্ঠান বা বাংলোতে বায়োস্কোপ প্রদর্শন করেন। হীরালাল সেন প্রথম জনসম্মুখে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন ভোলার তৎকালীন সাব ডিভিশন অফিসার (এসডিও) কার্যালয়ে ১৮৯৮ সালের ১৭ই এপ্রিল। যা এক সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। জানা যায় ঐ সময় মি. বিটসন বেল নবগঠিত বরিশাল জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ শাসিত উপমহাদেশের পূর্ববঙ্গে দক্ষিণাঞ্চল বরিশাল জেলা গঠিত হলে ব্রিটিশ অফিসারগণ মহকুমা/সাব-ডিভিশন ভাগ করে গ্রামবাংলায় ঘুরে বেড়াতেন। বরিশাল তখন ধান, সুপারি ও নারকেলের জন্য বিখ্যাত ছিল। অফিসারগণ জনগণের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন ও মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতেন। তখনকার দিনে ব্রিটিশ অফিসারগণ সংস্কৃতিমনা ছিলেন বলে তারা গ্রামগঞ্জে সাধারণ মানুষদের আনন্দ-বিনোদনের জন্য মেলার আয়োজন করতেন। তখন বৈশাখি মেলা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হীরালালের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। তার এক আত্মীয় ভোলার এসডিও কার্যালয়ে চাকুরিসূত্রে হীরালাল বায়োস্কোপ প্রদর্শনের সুযোগ পান। এখানে উল্লেখ্য যে, ভোলা তখন অজপাড়াগাঁ হওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই কঠিন ছিল। তাই তখনকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা *ঢাকা প্রকাশ*-এর খবরে লেখা আসেনি। ঠিক ঐ দিনই কলকাতা থেকে আগত ব্রেডফোর্ড কোম্পানি কর্তৃক ঢাকার সদরঘাটের ক্রাউন থিয়েটারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের খবর পাওয়া যায়। তবে এটা স্বীকৃত যে, হীরালাল সেন কর্তৃক প্রথম জনসম্মুখে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয় পূর্ববঙ্গের ভোলার সাব-ডিভিশন অফিসার (এসডিও) কার্যালয়ে। যা চলচ্চিত্র গবেষকদের বইতে পাওয়া যায়। এরপর হীরালাল সেন ঢাকার নবাব পরিবারে ও গাজীপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ীতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এরপর রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি বাংলার বিভিন্ন স্থানে চলচ্চিত্র দেখাতে শুরু করেন।

১৯০০ সালে বিদেশ থেকে মুভি ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। বিলেতের প্যাথে কোম্পানি কর্তৃক এ সময় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য একজন মুভি ক্যামেরাম্যান কলকাতায় প্রেরণ করা হয়। হীরালাল ঐ মুভি ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে ক্যামেরা চালানোর কলাকৌশল শিক্ষালাভ করেন। এরপর পথেঘাটে ও সামাজিক অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যপূর্ণ গতিশীল দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রখ্যাত নাট্যপ্রযোজক, নাট্যকার, নট অমর দত্তের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় জনপ্রিয় বাংলা নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করে ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯০১ সালে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রদর্শন করেন। বিশেষ বিশেষ দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত জনপ্রিয় নাটকগুলো হলো– আলীবাবা, সীতারাম, বুদ্ধচরিত, হরিরাজ, সরলা, ভ্রমর, দোললীলা, সীতার বনবাস, চৈতন্যলীলা, বিলুমঙ্গল, নলদময়ন্তী প্রভৃতি। ১৯০৩ সালে তিনি প্রথম বাংলায় বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেন। এগুলো হলো– সি. কে. সেনের মাথার তেল 'জবাকুসুম', বটফেস্ট পালের 'অ্যাডওয়ার্ডস টনিক' ডব্লিউ মেজর কোম্পানির 'সালসাপিলা' উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি থেকেই বিজ্ঞাপন চিত্রগুলো নির্মিত হয়। তিনি ছিলেন অবিভক্ত ভারতের তথা আফ্রো-এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রকার।

১৯০৫ সালে শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। হীরালাল সেন এই আন্দোলনের চিত্র ধারণ করে ২২শে অক্টোবর কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে প্রদর্শন করেন। তাঁর প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পারস্য প্রসূন (ফ্লাওয়ার অব পারসিয়া) এবং সর্বশেষ চলচ্চিত্র পূর্ণদৈর্ঘ্য মঞ্চ নাটকের চিত্ররূপ 'রঙিন আলীবাবা' (১৯১৩)। তিনি প্রামাণ্যচিত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র, নাট্যচিত্র ও রাজনৈতিক চিত্র নির্মাণ করেন। ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রায় অর্ধশত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তন করে বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে প্রথম পুরুষের মর্যাদায় আসীন হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি প্রথম বিজ্ঞাপনে ফিল্ম ব্যবহার করেন। হীরালাল সেন ছিলেন চলচ্চিত্রের শিক্ষানবিশ, শিক্ষার্থী, নির্মাতা, প্রদর্শক ও শিক্ষক। এদেশে চলচ্চিত্র শিক্ষার গোড়াপত্তনের যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন। এই মহান চলচ্চিত্র নির্মাতা জীবনের শেষ অবস্থায় এসে দুঃখকষ্ট ও রোগশোকে ভোগার পর ২৮শে অক্টোবর ১৯১৭ সালে কলকাতায় স্ত্রী হেমাঙ্গী দেবীর কোলে বিজয়া দশমীর শেষ প্রহরে পরলোকগমন করেন।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে বরিশাল জেলার ভোলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ১২২ বছর হয়ে গেল। বিশ্ব চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয় ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। তার মাত্র আড়াই বছরের কম সময়ে ১৮৯৮ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ছিল বিস্ময়কর। তাও আবার দুর্গম দ্বীপ ভোলায়। সুতরাং বলা যায় ঢাকার সন্তান হীরালাল সেনই পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ।

লেখক: চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখক, গবেষক ও নির্মাতা

করোনাকালে ডেঙ্গু সচেতনতা

শফিকুল ইসলাম

বিশ্বজুড়ে চলছে করোনা আতঙ্ক। এরই মধ্যে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। করোনা ভাইরাস মহামারির মধ্যেও বংশবিস্তার থেমে নেই এডিস মশার। সাধারণত জুন মাসে প্রতিবছর ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ শুরু হয়। এই সময় জ্বর হলে তা ডেঙ্গুও হতে পারে আবার করোনা ভাইরাসও হতে পারে, আবার হতে পারে সাধারণ মৌসুমি জ্বরও। তাই হেলাফেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

কোভিড-১৯ এবং ডেঙ্গু দুটোই ভাইরাসজনিত জ্বর। দুটোতেই কিছু উপসর্গ একেবারে এক রকম। যেমন: জ্বর বা জ্বরজ্বর ভাব, শরীর মেজমেজ করা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি। তবে এদের কিছু বিশেষত্বও আছে। ডেঙ্গু জ্বর হলে জ্বরের সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, শরীরের হাড়ে ব্যথা থাকে। আর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে জ্বরের সঙ্গে গলাব্যথা, অরুচি, স্বাদহীনতা, কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ডায়রিয়া বা পেটের সমস্যা দুটোতেই হতে পারে। আবার দুটো ক্ষেত্রেই ক্ল্যাসিক্যাল উপসর্গ নাও থাকতে পারে। তাই জ্বর ডেঙ্গু না করোনার কারণে, বোঝা মুশকিল হতে পারে অনেক সময়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা তাই এ সময় জ্বর হলে দুটো পরীক্ষাই করাতে বলেছেন।

ভাইরাসজনিত রোগের তেমন কোনো চিকিৎসা নেই। ডেঙ্গু ও করোনা ভাইরাস উভয়ের বেলায়ই তা প্রযোজ্য। এসব ক্ষেত্রে যে চিকিৎসা দেওয়া হয় তা উপসর্গ ও জটিলতাভিত্তিক। তবে জ্বর হলে যে-কোনো ব্যক্তিকে এখন বাড়িতে অন্যদের থেকে আলাদা থাকতে হবে। মাস্ক পরাসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। এ দুটি রোগের ক্ষেত্রে পান করতে হবে প্রচুর পানি ও তরল জাতীয় খাদ্য এবং নিতে হবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম। পরীক্ষা করা ও রিপোর্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে উপসর্গগুলো খেয়াল করতে হবে। ডেঙ্গুর জটিলতা হিসেবে রক্তচাপ কমে যেতে পারে, মাড়ি, ত্বক বা অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে অস্বাভাবিক রক্তপাত হতে পারে। এরকম হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। আবার করোনার কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, রক্তে অক্সিজেন কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রেও দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডেঙ্গুতে রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়ে আর করোনায় রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এ দুটি একে অন্যের বিপরীত। তাই খুব সতর্কভাবে চিকিৎসার দরকার।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্তদের একটি বড়ো অংশই শিশুরা। তাই শিশুদের ডেঙ্গু থেকে রক্ষায় মা-বাবা বা অভিভাবকদেরকেই সচেতনতার সাথে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

করোনার এ সময় ডেঙ্গুর মৌসুম শুরু হওয়ায় স্বাস্থ্য খাতে তৈরি হয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন কিছু পরামর্শ। যেমন–

১. এডিস মশার উৎস ধ্বংস করতে হবে। এ মশা সাধারণত গৃহস্থালির পরিষ্কার স্থির পানিতে জন্মে। যেমন: ফুলের টব, গাড়ির টায়ার বা ডাবের খোলে বৃষ্টির জমা পানি ইত্যাদি। তাই এডিস মশার লার্ভা জন্ম নিতে পারে এমন স্থানগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো নষ্ট করে ফেলতে হবে।

২. বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩. দিনে ও রাতে ঘুমানোর সময় মশারি টানাতে হবে। নবজাতক ও শিশুদের সার্বক্ষণিক মশারির ভেতরে রাখা জরুরি।

৪. শিশুরা যে সময়টায় বাইরে ছুটাছুটি বা খেলাধুলা করে, সে সময়টায় তাদের শরীরে মসকুইটো রেপেলেন্ট অর্থাৎ মশা নিরোধীকরণ স্প্রে, ক্রিম বা জেল ব্যবহার করা যেতে পারে। কয়েক ঘণ্টা অন্তর পুনরায় এই রেপেলেন্ট প্রয়োগ করতে হবে।

৫. মশা প্রতিরোধ অ্যারোসল, মশার কয়েল বা ফাস্ট কার্ড শিশু থেকে শুরু করে সবার জন্যই ক্ষতিকর। তাই এগুলোর পরিবর্তে মসকুইটো কিলার বাল্ব, ইলেকট্রিক কিলার ল্যাম্প, ইলেকট্রিক কয়েল, মসকুইটো কিলার ব্যাট, মসকুইটো রেপেলার মেশিন, মসকুইটো কিলার ট্র্যাপ ইত্যাদির সাহায্যে নিরাপদে মশা ঠেকানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে এই সরঞ্জামগুলো যেন শিশুর নাগালের বাইরে থাকে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

৬. যদি শিশুর মা ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হন, তাহলে সেই ভাইরাসের কোনো প্রভাব মায়ের বুকের দুধে পড়ে না। কাজেই আক্রান্ত অবস্থায় মা তার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন।

‘শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম’

গুজব নয়
সঠিক তথ্য দিয়ে
করোনাকালে
একে অন্যের পাশে থাকুন।

পিআইডি

৭. বাড়িতে ডেঙ্গু রোগী থাকলে তাকে দিন-রাত মশারির ভেতর রাখতে হবে যেন অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে না পারে।

৮. নির্মাণাধীন ভবনগুলো এডিস মশার অন্যতম প্রধান উৎসস্থল। তাই প্রতি তিন দিন অন্তর জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করতে হবে।

ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণে 'ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেল' গঠিত হয়েছে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে ডেঙ্গুর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ডেঙ্গু মশার আবাসস্থল বিনষ্টকরণ কার্যক্রম মনিটরিং করবে এই ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেল। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজধানীবাসীকে ডেঙ্গু থেকে সুরক্ষা দিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ৫৪টি ওয়ার্ডে বছরব্যাপী বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে। ৬ই জুন থেকে শুরু হয় ডিএনসিসি'র প্রথম পর্বের এই চিরুনি অভিযান। ১০ দিনব্যাপী পরিচালিত এ অভিযানে প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। আবার প্রতিটি সেক্টরকে ১০টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিদিন প্রতিটি ওয়ার্ডের ১টি সেক্টরে, অর্থাৎ ১০টি সাব-সেক্টরে অভিযান চালানো হয়। এভাবে ১০ দিনে সারা ডিএনসিসি এলাকায় চিরুনি অভিযান সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি সাব-সেক্টরে ৪ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও ১ জন মশক নিধনকর্মী, অর্থাৎ প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিদিন ৪০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও ১০ জন মশক নিধনকর্মী ডিএনসিসি'র আওতাধীন বিভিন্ন বাড়ি, স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কোথাও এডিস মশার লার্ভা আছে কি-না, কিংবা কোথাও তিন দিনের বেশি পানি জমে আছে কি-না, কিংবা ময়লা-আবর্জনা আছে কি-না, যেগুলো এডিস মশার বংশবিস্তারে সহায়ক, তা পরীক্ষা করেন।

চিরুনি অভিযান চলাকালে যেসব বাড়ি বা স্থাপনায় এডিস মশার লার্ভা কিংবা বংশবিস্তার উপযোগী পরিবেশ পাওয়া যায়, তার ছবি, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে একটি অ্যাপে সংরক্ষণ করা হয়। এতে করে পরবর্তীতে ডিএনসিসি'র কোন কোন এলাকায় এডিস মশা বংশবিস্তার করেছে তার একটি ডাটাবেজ তৈরি হবে। ডাটাবেজ অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি মনিটর করা সহজ হবে। ডিএনসিসি'র প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিরুল ইসলাম অ্যাপটি তৈরি করেছেন। প্রথম পর্বের চিরুনি অভিযানে ১০ দিনে ডিএনসিসি'র ৫৪টি ওয়ার্ডে মোট ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৩৫টি বাড়ি, স্থাপনা, নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করে মোট ১ হাজার ৬০১টিতে এডিস মশার লার্ভা এবং ৮৯ হাজার ৬২৬টি বাড়ি/স্থাপনায় এডিস মশা বংশবিস্তার উপযোগী পরিবেশ পাওয়া যায়। এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ অনুযায়ী এই ১০ দিনে মোট ২১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। পরবর্তীতে একই অপরাধে কেউ অভিযুক্ত হলে আরো কঠোর শাস্তি এমনকি জেল পর্যন্ত হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, আগামী মাসে ডিএনসিসি'র চিরুনি অভিযানের ২য় পর্ব শুরু হবে। ডিএনসিসি'র মেয়র আতিকুল ইসলাম সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে আমরা বার্ষিক পরিকল্পনা নিয়েছি। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত আমরা চিরুনি অভিযান পরিচালনা করব।

অন্যদিকে ৭ই জুন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃক বংশাল থেকে একযোগে ৭৫টি ওয়ার্ডে বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় মশক স্প্রে মেশিন দিয়ে লার্ভিসাইডিং কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করেন মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। বিশেষজ্ঞদের মতে, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শুধু ওষুধ ছিটানো নয় বরং নিতে হবে সমন্বিত মশক ব্যবস্থাপনার মতো বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ যা ধ্বংস করবে মশার আবাসস্থল।

ডেঙ্গুর কোনো স্বীকৃত টিকা বা ভ্যাকসিন নেই। তাই সচেতনতাই পারে ডেঙ্গু থেকে আমাদের রক্ষা করতে। নিজকে সুরক্ষিত রাখার একমাত্র উপায় হলো মশার কামড় থেকে নিজকে রক্ষার ব্যবস্থা করা। সরকারি পর্যায়ে যতই মশকনিধন কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক না কেন, আমরা নিজেরা সচেতন না হলে তা কখনো ফলপ্রসূ হবে না। গত বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর ঘটনা ছিল বিগত ২০ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তাই এ বছর যেন এমন পরিস্থিতি না হয় তাই এখনই আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। নিতে হবে ব্যক্তি উদ্যোগ যেন আমরা নিজেরাই আমাদের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে এডিস মশার প্রজননকে রুখে দিতে পারি। আসুন সবাই সচেতন হই, ডেঙ্গু প্রতিরোধ করি।

লেখক: প্রাবন্ধিক

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘের স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ এক সেট স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের পোস্টাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ উদ্যোগে 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের আন্তর্জাতিক দিবস ২০২০ (শান্তিরক্ষী দিবস)' উপলক্ষে ২৯শে মে এই ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়। স্মারক ডাকটিকিটের ফলিওতে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, মুজিববর্ষের লোগো এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতিসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ছবি। আরো রয়েছে জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিয়োজিত বাংলাদেশের দুজন নারী হেলিকপ্টার পাইলটের প্রতিকৃতি।

১৯৭৪ সালে সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা তাঁর কালজয়ী ভাষণে বলেছিলেন, 'মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার' এবং 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়'।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দিনটি উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ব্লু হেলমেটের অধীনে দায়িত্ব পালন করতে জীবন উৎসর্গকারীদের স্মৃতির উদ্দেশে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। পরে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিসংঘ মহাসচিব ২০১৯ সালে কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী ৮৩ জন শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর 'দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেলে' ভূষিত করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের দুজন আত্মোৎসর্গকারী শান্তিরক্ষীও রয়েছেন। তাঁরা হলেন– কনস্টেবল মোহাম্মদ ওমর ফারুক এবং সৈনিক আতিকুল ইসলাম। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৮ সালে। অন্যতম শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণাকারী দেশ বাংলাদেশের ১ লাখ ৭০ হাজার ২২১ জন শান্তিরক্ষী এ পর্যন্ত ৪২টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

হলো না বাবার কবর জিয়ারত

সালাম হাসেমী

সময়টা ৫ই মার্চ, ২০২০। সকাল বেলা। কনস্টেবল হায়দার আলী পুলিশের চাকরি করেন। ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন। ছুটি সমাপ্তে আজ কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে তার সাইড ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ছয় বছরের কন্যা জান্নাত তার গলা জড়িয়ে ধরল এবং দশ বছরের পুত্র ফেরদৌস এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্বরে পিতাকে প্রশ্ন করল, আবার কবে বাড়ি আসবে। পিতা তার আদরের সন্তানদের উত্তরে বলল– ২৫শে মে, পবিত্র ঈদুল ফিতর হবে। ঈদের দুই-এক দিন আগে ছুটি পেতে পারি। সেই সময় আসব। কন্যা জান্নাত পিতার কপালে চুমু দিয়ে বলল, এবার ঈদে আমাকে সুন্দর এক সেট পোশাক ও একটা বড়ো পুতুল কিনে দিবে না বাবা? হ্যাঁ দিব– জবাব দিল পিতা। ফেরদৌস তার বোনকে পিতার নিকট আবদার করতে দেখে সে তার পিতার আরো নিকটবর্তী হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে দিবে না? পিতা তার পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, হ্যাঁ, তোমাকেও দিব। ঠিক মতো লেখাপড়া কর। স্ত্রী ফরিদা বেগম স্বামীর পানে তাকিয়ে বলল, কর্মস্থলে পৌঁছিয়ে মোবাইলে ফোন করে জানাবে যে ঠিকমতো পৌঁছালে কি-না? স্বামী স্ত্রীর মুখ পানে তাকিয়ে চোখ রেখে একটু মুচকি হেসে জবাব দিল, অবশ্যই জানাব। সাইড ব্যাগ তার বাম কাঁধে ঝুলিয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঘরের দরজার চৌকাঠে আঘাত লেগে ডান পায়ের আঙুলে ভীষণ আঘাত পেয়ে ব্যথায় 'উহ্' করে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রী তার কাছে এসে তাকে ধরে এনে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে বললেন, যাওয়ার সময় বাধা পেয়েছ একটু বিলম্ব করে যাও। হায়দার আলী তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সময় বেশি নেই। এখনই ট্রেন এসে পড়বে। কালবিলম্ব করলে ট্রেন আর ধরতে পারব না। এ ট্রেন ধরতে না পারলে আজ আর যাওয়া হবে না। যথাসময় কর্মস্থলে পৌঁছাতে না পারলে চাকরি থাকবে না। এ কথা বলে স্ত্রী ফরিদা বেগমের মুখপানে একবার তাকিয়ে আবার রওয়ানা দিলেন। পায়ে হেঁটে রাস্তায় এসে অটোবাইকে করে রেলস্টেশনে পৌঁছালেন। যথাসময় ট্রেন এলে ওই গাড়িতে করে ঢাকা পৌঁছলেন। পরের দিন কর্মস্থলে যোগদান করে কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ঢাকায় এসে কয়েক দিন পরেই কনস্টেবল হায়দার আলী জানতে পারলেন যে, আমাদের দেশে নভেল করোনা ভাইরাস রোগ এসেছে। কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছে। কয়েক দিন পরে দেখা গেল এ মরণ রোগে কয়েকজন মারা গেছে। দিনের পর দিন আরো লোক জ্যামিতিক হারে আক্রান্ত হচ্ছে। করোনা ভাইরাস হলো একটি ছোঁয়াচে রোগ। একজন সংক্রমিত হলে তার স্পর্শে যে লোক আসবে সেই এ রোগ আক্রান্ত হয়। রোগীর হাঁচি-কাশি থেকে এ রোগ হয়। দেশের এই অবস্থা দেখে সরকার সারা দেশে 'লকডাউন' ঘোষণা দিলে টেলিভিশন, রেডিও, খবরের কাগজের মাধ্যমে জানানো হলো, দেশের সকল লোকজনকে তাদের নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে কেউ ঘরের বাহির হলে মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির দূরত্ব হবে এক মিটার বা তিন ফুট। এছাড়া কোনো ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হলে তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হবে। বিদেশ থেকে কোনো ব্যক্তি নিজ দেশে আসলে সেই ব্যক্তিকে তার পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা থাকতে হবে। এজন্য সে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবে। লোকজন এ সময় এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায় যেতে পারবে না। এ ঘোষণা যাতে দেশের জনগণ যথাযথভাবে পালন করে তা দেখাশুনার জন্য সারা দেশে সরকার পুলিশ, র‍্যাব, বর্ডার গার্ড, আর্মি, আনসার নিয়োগ করে। তারা দেশের জনগণের আইনশৃঙ্খলার কাজে মনোনিবেশ করল। সারা দেশের মানুষকে ঘরে অবস্থান করতে বলা

হলো। দেশের রাস্তা-ঘাটে, শহরে, বন্দরে গাড়ি-ঘোড়া চলাচল, অফিস-আদালত ও মিলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল। শহরের রাস্তাগুলো ফাঁকা। এই লকডাউনের ফলে দেশের সাধারণ দিনমজুর লোকগুলো বেকার হয়ে পড়ল। তারা আয় রোজগার করতে পারে না বলে তারা যেন খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারে তাই সরকার এই হতদরিদ্র লোকগুলোকে ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

প্রতিদিন টেলিভিশনে আমাদের দেশের ও বিদেশের করোনা রোগে আক্রান্তের ও মৃত্যুর সংখ্যার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। করোনার এ খবর শুনে দেশের জনগণ আতঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়েছে। কখন কাকে আক্রমণ করে সেই আতঙ্কেই সবার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। দেশের জনগণ যাতে অকারণে ঘরের বাহির হয়ে গায়ে গায়ে মিশে রাস্তাঘাটে, হাটেবাজারে ঘুরাফেরা না করে সেই জন্য সরকার দেশের লোকজনকে শৃঙ্খলায় রাখার জন্য রাস্তায় রাস্তায়, মোড়ে মোড়ে পুলিশ,

র‍্যাব, বর্ডার গার্ড, সশস্ত্র বাহিনীর লোক মোতায়েন করল। কনস্টেবল হায়দার আলীকে ডিউটি দেওয়া হলো পুরানো ঢাকার চাঁনখারপুল বস্তি এলাকায়। হায়দার আলী এই এলাকায় ডিউটি করতে এসে দেখলেন যে, এই এলাকার সাধারণ লোক বিশেষ করে বস্তি এলাকার লোকজন খুবই উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া। তারা শৃঙ্খলায় থাকতে চায় না। তাদের ঘরে থাকতে বলা হলেও তারা ঘরের বাইরে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, ধূমপান করছে, রাস্তার পাশে পাটি বিছিয়ে লুডু খেলছে, হইচই করছে, দৌড়াদৌড়ি ও লাফালাফি করছে। কেউ কেউ ফুসকা, বাদাম ও সিগারেট বিক্রি করছে। বস্তির লোকগুলো ঘরেও থাকতে চাচ্ছে না আবার রাস্তায় তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছে না। কেউ মুখে মাস্কও ব্যবহার করছে না। কনস্টেবল হায়দার আলী এই উচ্ছৃঙ্খল বস্তির লোকগুলোকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের ডেকে বুঝিয়ে বললেন ঘরে থাকতে এবং বাইরে এলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে, মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে। লোকগুলোকে যতই তিনি বুঝাচ্ছেন কিছুতেই তারা তার কথা শুনছে না। তারা দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েক দিন পরে শোনা গেল বস্তিতে কয়েক জন লোক নভেল করোনা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এ খবর শুনে বস্তিবাসীকে সরকার তাদের নিজ নিজ ঘরে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তারা নিজ গৃহে রইল না। করোনা ছড়ালো জন থেকে জনে। কনস্টেবল হায়দার আলী প্রতিদিন ওই উচ্ছৃঙ্খল বস্তিবাসীকে তার হাত দিয়ে ঠেলে ঘরে পাঠায়।

ডিউটি শেষে হায়দার আলী মেসে ফিরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষে শুয়ে পড়ে। গ্রামের বাড়ি থেকে তার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী মোবাইলে ফোন করে জানতে চায় কবে তিনি ছুটিতে বাড়ি আসবেন। হায়দার আলী উত্তরে বলে, করোনার ডিউটি রেখে বাড়ি যাওয়া যাবে না। এ সময় তাকে ছুটি দেওয়া হবে না। পুত্র-কন্যা ও স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমিয়ে হায়দার আলী স্বপ্নে দেখেন তিনি ঈদের দিন ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছেন। ছেলেমেয়ে, স্ত্রী নিয়ে ঈদের বাজার করছেন। সবার জন্য বেশ চমৎকার চমৎকার জামাকাপড় ক্রয় করেছেন। সবাই ঈদের পোশাক পেয়ে খুশি। মেয়েটি একটি বড়ো পুতুল কেনার জন্য বায়না ধরেছে। হঠাৎ করে কন্যা জান্নাত একটি দোকানে বড়ো একটি পুতুল দেখে সেই দিকে ছুটে যেতে গিয়ে পড়ে যায়। হায়দার আলী তার কন্যাকে দৌড়িয়ে গিয়ে তুলতে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘুম ভেঙে যায়। পরেরদিন তার পুত্র-কন্যার কথা ভাবেন আর করোনার ডিউটি করেন। একদিন তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সর্দি, কাশি, জ্বর ও গলা ব্যথা হয়। বুকের মধ্যে ব্যথা করে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। করোনা পরীক্ষা করলে তার রিপোর্ট পজেটিভ হয়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। করোনার সাথে যুদ্ধ করে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার নয় দিন পরে দূরে বহু দূরে না ফেরার দেশে চলে গেলেন। তার প্রাণহীন দেহকে সাদা পোশাক পরিহিত চারজন লোক এসে নিয়ে গেল গাড়িতে তুলে। করোনার বিধান মোতাবেক তাকে সমাহিত করা হলো। হায়দার আলীর বাড়িতে তার স্ত্রীর নিকট মোবাইল ফোনে মৃত্যুর খবর দেওয়া হলো। তার স্ত্রী সংবাদ প্রেরণকারীর নিকট তার স্বামীর লাশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, করোনায় আক্রান্তে মৃতদেহকে যে নিয়মে কবরস্থ করা হয় সেই বিধানেই তার শেষকৃত করা হয়েছে। তাকে কোথায় দাফন করা হয়েছে এ ব্যাপারে তার স্ত্রী জানতে চাইলে সংবাদ প্রেরণকারী বলতে পারে না বলে ফোন বন্ধ করে দেয়।

কনস্টেবল হায়দার আলীর মৃত্যুর কথা শুনে তার বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তিনদিনের মিলাদ মাহফিল সমাপ্তের পর হায়দার আলীর পুত্র ফেরদৌস লকডাউনের মধ্যে ঢাকা পথে রওয়ানা হলো। কিছু পথ পায়ে হেঁটে, কিছু পথ রিকশায়, কিছু পথ চাল বোঝাই ট্রাকে করে সন্ধ্যায় ঢাকা পৌঁছাল। সারাদিন খাওয়া হয়নি। প্রচুর ক্ষুধা পেয়েছে। ঢাকা শহরের কোনো হোটেল খোলা নেই। লকডাউনে সব দোকানপাট, হোটেল বন্ধ। রাত হয়ে গেছে। সে এখন কোথায় যাবে? এ কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তায় কর্তব্যরত এক পুলিশের নিকট গিয়ে তার পরিচয় দিল। সেই কর্তব্যরত পুলিশ তাদের মৃত স্টাফ-এর পুত্র ফেরদৌসকে সঙ্গে করে তাদের মেসে নিয়ে গেল। সেখানে তার নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করল। পরেরদিন তাকে নিয়ে তাদের অফিসে যায় তার বাবাকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে সে তথ্য জানার জন্য। তার বাবাকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারল না কেউ। ওই অফিস ফেরদৌসকে বলে দিল তার বাবা কোন হাসপাতালে ভর্তি ছিল সেই হাসপাতালে গিয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করতে যে তার বাবাকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে। ফেরদৌস হাসপাতালে গিয়ে নার্স, ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করে তার বাবাকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে? তারা কেউ বলতে পারল না। তারা তাকে পাঠাল করোনায় মারা যাওয়া লাশ যারা মাটি দেয় তাদের কাছে। তারা ফেরদৌসকে বলল যে, তারা হাসপাতাল থেকে করোনায় মারা যাওয়া মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে দাফন করেছে। কারো নাম পরিচয় তারা জানে না। কাজেই এ পর্যন্ত তারা যত মানুষ দাফন করেছে তাদের কে ফেরদৌসের বাবা হায়দার আলী ছিলেন তারা তা বলতে পারবে না এবং কোথায় তাকে দাফন করেছেন তাও তারা বলতে পারবে না। এ কথা শুনে ফেরদৌসের দু'নয়ন অশ্রু সজল হলো। সে তার বাবার কবর খুঁজে পেল না বলে মনের দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পথে পা বাড়ালো।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৫শে মে ২০২০ বঙ্গভবনে দরবার হলে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনায় সংকটে দেশের শ্রমজীবী মানুষ

বিশ্বব্যাপী নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ভয়াল থাবা আঘাত এনেছে। ফলে গভীর সংকটে পড়েছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসহ দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। এ পরিস্থিতিতে সরকার জনগণের পাশে থেকে ত্রাণ কাজ পরিচালনাসহ সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সবাইকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে একযোগে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। ১লা মে 'মহান মে দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এই আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারের পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকদেরও শ্রমজীবী মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বানও জানান তিনি।

করোনা মোকাবিলায় নার্সরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা দেশ থেকে করোনা ভাইরাস নির্মূলে সক্ষম হব। বর্তমানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সৃষ্ট মহামারি মোকাবিলায় নার্সরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১২ই মে 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। জনগণকে আন্তর্জাতিক মানের সেবা দিতে নার্স ও মিডওয়াইফদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সৃষ্ট মহামারি মোকাবিলায় নার্সরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের দেশেও করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নার্সিং স্টাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২০' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এবারের আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য 'নার্স : এ ভয়েস টু লিড-নার্সিং দ্য ওয়ার্ল্ড টু হেলথ' যথার্থ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, একটি দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নার্সিং স্টাফ একটি অপরিহার্য উপাদান। আধুনিক নার্সিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২০ সালকে আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফ বর্ষ ঘোষণা করেছে।

করোনা থেকে রক্ষায় কদরের রাতে প্রার্থনা করার আহ্বান

করোনা ভাইরাসের মহামারি থেকে রক্ষার জন্য পবিত্র শবে কদরের রাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ২১শে মে পবিত্র শবে কদর উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এই আহ্বান জানান। তিনি মহিমান্বিত রজনী পবিত্র শবে কদরে দেশবাসীসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশও এই ভাইরাসের আক্রমণের শিকার। আসুন শবে কদরের এই পবিত্র রজনীতে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে এ মহামারি থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করি। এছাড়া পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অশেষ রহমত ও বরকত কামনার পাশাপাশি দেশের অব্যাহত অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানাই। মহান আল্লাহ আমাদের মোনাজাত কবুল করুন। আমিন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে ২৬শে মে ২০২০ বঙ্গভবনে নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা জুন ২০২০ যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত GAVI-এর ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে Global Vaccine Virtual Summit 2020-এ ভাষণ দেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য সচেতনতায় নতুন ৫ নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জুন গণভবন থেকে মেট্রোরেল প্রকল্পের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে নতুন ৫টি নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে জনগণ, দলীয় নেতাকর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের প্রতি এ নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনাসমূহ হলো– ১. সর্বত্র স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সংক্রমণ রোধে কার্যপদ্ধতি অনুসরণ; ২. গণপরিবহণে চলাচলের সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা; ৩. সবসময় মাস্ক পরিধান করা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলা; ৪. দলীয় নেতাকর্মীদের নিজেদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার এবং তা প্রতিপালনে জনগণকে সচেতন করাতে হবে; ৫. স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং আপদকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

ভ্যাকসিন সম্মেলনে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা জুন লন্ডনে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই) আয়োজিত গ্লোবাল ভ্যাকসিন সামিটে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের দেখিয়েছে সংক্রামক রোগ কোনো সীমান্ত চিনে না এবং দুর্বল, ক্ষমতাধর কিংবা উন্নত, উন্নয়নশীল কাউকে আলাদা বিবেচনা করে না। এলক্ষ্যে এ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সব দেশকে একসঙ্গে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশনকে (জিএভিআই) সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়ার আহ্বান জানান।

সিআরপিকে ১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই জুন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসা, সহযোগিতা এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)-কে ১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেন, যাতে এটি ভালোভাবে পরিচালিত হতে পারে এবং জনগণকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করতে পারে।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা জুন ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রাণ তহবিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত অনুদান ও চিকিৎসা সামগ্রী গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

গণমাধ্যম কর্মী ছাঁটাই বন্ধ ও বেতন-ভাতা পরিশোধের আহ্বান

গণমাধ্যম কর্মীদের চাকরিচ্যুতি বন্ধ ও তাদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে প্রতিষ্ঠান কর্ণধারদের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ১১ই মে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি-ডিআরইউএ ব্র্যাকের সহায়তায় 'করোনা ভাইরাস সংক্রমণের নমুনা সংগ্রহ বুথ' উদ্‌বোধনকালে এ কথা বলেন তিনি।

করোনা দুর্যোগ পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, কিছু মিডিয়া হাউসে চাকরিচ্যুতি ঘটেছে, অনেকের বেতন দেওয়া হয়নি উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন– এদের কর্ণধারদের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাই, মহামারির এই দুঃসময়ে দয়া করে কাউকে চাকরিচ্যুত করবেন না এবং যাদের বেতন বাকি আছে, তা দিয়ে দিন। কারো অপরাধ থাকলেও, শাস্তি দেবার সময় এটি নয়। প্রতিষ্ঠান প্রধানরা হয়ত বলবেন সমস্যা আছে, কিন্তু আমি বলব, আগে সমস্যা ছিল না এবং কয়েক মাস পরেও সমস্যা থাকবে না।

সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা যাতে ঠিকমতো হয়, সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেকগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ক্রোড়পত্রের বিল দেওয়ার ব্যবস্থা করছি আমরা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ৫৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে, তাদের সংস্থা থেকে গণমাধ্যমের যত বিল বাকি আছে সেগুলো পরিশোধের জন্য। আমাদের মন্ত্রণালয় থেকেও একটি তাগিদপত্র দেওয়া হচ্ছে। এসব বিলের পরিমাণ শত শত কোটি টাকা। মালিকপক্ষ নিশ্চয়ই যোগাযোগ রাখছেন। ইতিপূর্বে কখনো এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, এরূপ চিঠিও দেওয়া হয়নি। এখন দেওয়া হয়েছে, যাতে গণমাধ্যম, বিশেষত সংবাদপত্রে কারো বেতন-ভাতা বকেয়া না থাকে সেজন্য।

সম্মুখযোদ্ধা গণমাধ্যম কর্মীদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী দিন

করোনার সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে গণমাধ্যম কর্মীদের কাজে পাঠানোর আগে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী দেবার জন্য প্রতিষ্ঠান মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ১২ই মে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ উদ্‌বোধনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকরা করোনা মোকাবিলায় সম্মুখযোদ্ধা। প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, গণমাধ্যম কর্মীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী দিয়ে তারপর কাজে পাঠান। তা না করা হলে করোনায় আক্রান্তের সুযোগ থাকে। মন্ত্রী এ সময় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে চিকিৎসক, নার্স, পুলিশ, সেনাবাহিনী,

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৮ই মে ২০২০ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কৃষকদের মাঝে বীজ ও রিপার মেশিন বিতরণ করেন–পিআইডি

গণমাধ্যম কর্মী ও দায়িত্বপালনরত সকলকে অভিনন্দন জানান এবং সম্প্রতি প্রয়াত তিন সাংবাদিকের আত্মার শান্তি কামনা ও করোনায় আক্রান্ত প্রায় একশ সাংবাদিকের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করেন।

তথ্যমন্ত্রী আরো জানান, সকল গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বিএসএমএমইউ'তে করোনা টেস্টে 'ফাস্ট ট্র্যাক' বা অগ্রাধিকার সুবিধার জন্য তিনি যে অনুরোধ করেছিলেন, বিএসএমএমইউ তা কার্যকর করেছে। গণমাধ্যম কর্মীদের করোনা চিকিৎসায় শয্যা সংরক্ষণে সাংবাদিকদের অনুরোধে অন্য একটি হাসপাতালেও কথা বলবেন বলে জানান তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্ব আজ করোনায় থমকে গেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় তারা প্রাণহানি ঠেকাতে পারছে না। বিশ্বে এ প্রাদুর্ভাব দেখার সাথে সাথেই আমাদের সরকার নানা ব্যবস্থা নেওয়ায় অনেক উন্নত ও প্রতিবেশী দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থা ভালো আছে। কিন্তু তাই বলে আমরা বসে নেই, যে-কোনো পরিস্থিতি হতে পারে, তা মাথায় রেখেই সরকার সমস্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১২ই মে ২০২০ জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)-এর সদস্যদের মধ্যে করোনা দুর্যোগে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে মে ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

লকডাউন শিথিল করা মানে অপ্রয়োজনে বাইরে নয়

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ জনগণকে যত দূর সম্ভব ঘরে থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, অদৃশ্য একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি। আমার সুরক্ষা আমার কাছে– এটি নিজে অনুধাবন করতে না পারলে জোর করে সুরক্ষা দেওয়া কঠিন। লকডাউন শিথিল করা মানে এই নয় যে অপ্রয়োজনে ঘোরাঘুরি করব, অকারণে বের হব বা জনসমাগম করব। ২৭শে মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন আয়োজিত সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, অহেতুক ঘর থেকে বের হয়ে ঘোরাঘুরি করায় করোনা রোগীর সংখ্যা ইতোমধ্যে বেড়েছে। সবাইকে চিন্তা করতে হবে আমরা একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে জীবন-জীবিকা দুটিই রক্ষা করতে হবে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে যেখানে এখনো ডজন ডজন মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করছে, সেখানেও অনেক জায়গায় লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। আমার সুরক্ষা যদি আমি না নিই তাহলে কাউকে তো জোর করে নেওয়ানো সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সার্বক্ষণিক সমস্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন, যে কারণে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেক দেশের মতো ভেঙে পড়েনি। পাকিস্তানেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছিল। সেখানে ডাক্তারদের অ্যারেস্ট করতে হয়েছে হাসপাতাল চালু রাখার জন্য। বাংলাদেশে সে রকম পরিস্থিতি হয়নি। দেশের যে সকল ডাক্তার সাহসিকতার সাথে করোনা আক্রান্তদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, অনেকে অহেতুক সরকারের সমালোচনা করেন। আমাদের ব্যবস্থাপনা যদি ভালো না হতো, তাহলে শনাক্ত রোগীর মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশেও বেশি হতো।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনায় অনেকে ধন্যবাদ না দিলেও বিশ্ব সম্প্রদায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মানুষের স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও জীবনরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছেন, তাঁর ফলেই ১৭ কোটি মানুষের এই উন্নয়নশীল দেশে দু'মাসের বেশি সময় প্রায় সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ হলেও সরকারের খাদ্য ও ত্রাণ সহায়তায় এখনো একজন মানুষও অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি। প্রায় সাত কোটি মানুষ নানাভাবে সরকারের সহায়তার আওতায় এসেছে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

মহান মে দিবস

১লা মে: রাজধানীসহ সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন পালন করে 'মহান মে দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি'

বিশ্ব অ্যাজমা দিবস

৭ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব অ্যাজমা দিবস'

বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস

৮ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় 'বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস'। এ দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মজয়ন্তী

এ বছর ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'তারুণ্য থেকে শুরু হোক থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ, বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিরাপদ রাখবে'

বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস

১০ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'পাখির মাধ্যমে যুক্ত সমগ্র বিশ্ব'

বিশ্ব মা দিবস উদ্‌যাপিত

১২ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব মা দিবস'। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল– 'তোমার তুলনা তুমিই মা'

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হয়। বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন দিবসটি ১৯৭৪ সাল থেকে দেশে দিবসটি পালন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'নার্স: এ ভয়েস টু লিড-নার্সিং দ্য ওয়ার্ল্ড টু হেলথ'

বিশ্ব পরিবার দিবস

১৫ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব পরিবার দিবস'। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'পরিবারের উন্নয়ন কোপেনহেগেন ও বেইজিং +২৫'

বিশ্ব পরিমাপ দিবস

২০শে মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব পরিমাপ দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'বিশ্ব বাণিজ্যে পরিমাপ উৎপাদক ও ভোক্তাকে সুরক্ষা দেয়'

শবে কদর পালিত

২১শে মে: সারা দেশে ভাবগাম্ভীর্য ও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় শবে কদর

ঈদুল ফিতর পালন

২৫শে মে: সারা দেশ করোনা আতঙ্কে আতঙ্কিত। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি-নিষেধ মেনে পালিত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মজয়ন্তী

এ বছর ডিজিটাল পদ্ধতিতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

৩১শে মে: সারা দেশে একযোগে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২০ সালের এসএসসি, মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রবাসী পুনর্বাসনে ৭০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন

করোনা ভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাজ হারিয়ে দেশে ফিরে আসা প্রবাসীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৭০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ফিরে আসা কর্মীদের দেশেই স্বাবলম্বী করতে এই তহবিল থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ফিরে আসা কর্মীদের বিমানবন্দরে নগদ অর্থ ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ রোধে দেশে লকডাউন চলাকালে কাজ হারিয়ে দেশে ফিরে আসা প্রবাসী কর্মীদের জনপ্রতি পাঁচ হাজার টাকা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও গ্লাভস দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত এসব বিতরণ করা হয়। ১লা জুন থেকে সরকার সবকিছু খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নগদ টাকা বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা যেন দেশে ফিরে কিছু করতে পারেন সেজন্য সহজ শর্তে ও কম সুদে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে মন্ত্রণালয়, প্রবাসীদের জন্য ৪ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জনসমাগমে অবশ্যই মাস্ক পরার পরামর্শ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

মুখে মাস্ক পরার ক্ষেত্রে নতুন পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সংস্থাটি বলছে, করোনা ভাইরাসের বিস্তাররোধে জনসম্মুখে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। মাস্ক পরেই বাইরে চলাচল

ধুনট থানা পুলিশের মাস্ক বিতরণ

করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, নতুন তথ্যে দেখা গেছে, ফেস মাস্ক 'সম্ভাব্য সংক্রামক ড্রপলেটের' জন্য বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে। যেখানে সামাজিক দূরত্ব রাখা সম্ভব হয় না যেমন– গণপরিবহণ, বিপণিকেন্দ্র, শরণার্থী শিবিরের মতো জায়গায় কাপড়ের মাস্ক দিয়ে অবশ্যই মুখ ঢাকতে হবে, যাতে সংক্রমণের বিস্তার না ঘটে। যাদের বয়স ষাটের বেশি কিংবা স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে তাদের সুরক্ষার জন্য মেডিক্যাল গ্রেড মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকাশনীতে প্রথমবারের মতো স্থান পেয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ববি)। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রকাশনী

সংস্থা 'নেচার' কর্তৃক পরিচালিত 'নেচার ইনডেক্স ২০২০'-এ বিশ্ববিদ্যালয়টির ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ইলিয়াস মাহমুদের গবেষণাপত্র বিশ্বমানের এই স্বীকৃতি অর্জন করল।

সম্প্রতি নেচার ইনডেক্স চলতি বছরের গবেষণা প্রকাশনী উন্মুক্ত করে। ঢাকায় মহাখালীতে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআরবি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইলিয়াস মাহমুদ 'পিট লেট্রিন (আধাপাকা টয়লেট) থেকে ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ কমানো' বিষয়ক একটি গবেষণাপত্র তৈরি করেন। এটি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি (এসিএস) থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে গত বছর প্রকাশিত হয়েছিল। সেই গবেষণাপত্রের জন্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর নেচার ইনডেক্সে অন্তর্ভুক্ত হয়। যার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে বিশেষ সম্মাননা।

বাংলাদেশের তৈরি কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং অ্যাপ সবাইকে ব্যবহারের অনুরোধ জানান তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

যুক্তরাজ্যভিত্তিক একাডেমিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা প্রকাশনী সংস্থা 'নেচার' প্রতিবছর প্রাকৃতিকভাবে মানুষ কীভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে অথবা রোগ বালাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে তা নিয়ে মানসম্পন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশ করে থাকে।

ইলিয়াস মাহমুদ জানান, আমার গবেষণা কাজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ায় আমি খুবই গর্বিত। আশা করি এই অর্জন সামনের গবেষণা কাজকে আরো বেশি উৎসাহিত করবে।

এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের তালিকা প্রকাশ

নতুন এমপিওভুক্ত এক হাজার ৬৩৩টি স্কুল ও কলেজের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকার মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪৩০টি। এছাড়া ৯৯১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজ ৬৮টি, উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান (কলেজ) ৯২টি ও ৫২টি স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর আগে গত বছরের ২৩শে অক্টোবর স্কুল-কলেজ-কারিগরি ও মাদ্রাসা মিলে মোট দুই হাজার ৭৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করতে তালিকা প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে স্কুল ও কলেজ ছিল এক হাজার ৬৫০টি। এরপর ঐ বছরের ১২ই নভেম্বর আরো ছয়টি এবং ১৪ই নভেম্বর একটি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়। চলতি অর্থবছরের মধ্যেই শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের বেতন পাবেন।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

করোনা ট্রেসার বিডি অ্যাপ

করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে নাগরিকদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে 'করোনা ট্রেসার বিডি' অ্যাপ চালু করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ৪ঠা জুন ভার্চুয়াল এক অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে অ্যাপটির উদ্‌বোধন করেন। আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে অ্যাপটি তৈরিতে কাজ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইইডিসিআর, এটুআই, এসডিএমজিএ এবং স্টার্টআপ সহজ।

অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুজন ব্যবহারকারীর কাছাকাছি থাকার সময় এবং ব্যবহারকারীদের অবস্থান সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করে রাখবে। এজন্য ব্যবহার হবে ব্লু-টুথ ও আধুনিক প্রযুক্তি। যখনই অন্য কোনো অ্যাপ ব্যবহারকারী একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে আসবে, তখনই অ্যাপ দুটি নিজেদের মধ্যে 'ডিজিটাল হ্যান্ডশেক' করে প্রয়োজনীয় তথ্য সুরক্ষিতভাবে আদান-প্রদান করবে। গুগল প্লে-স্টোর থেকে 'করোনা ট্রেসার বিডি' অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় আইসিটি অবকাঠামো ব্যবহার করে সমস্যা ও সংকট মোকাবিলায় সরকার একের পর এক প্রযুক্তিভিত্তিক নানা সমাধান নিয়ে আসছে। করোনার প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় এমন একটি অ্যাপ করোনা ট্রেসার বিডি, যা জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা বেষ্টনী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

রপ্তানি বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থানে পাট

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে চামড়াকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিল পাট খাত। বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বলেছেন, নির্মল ও দূষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বহুমুখী পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সব ধরনের সহায়তা করবে সরকার। এজন্য, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় পাট চাষিদের উদ্বুদ্ধকরণ ও পাট শিল্পের সম্প্রসারণে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারে তৎপর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

পাটজাত দ্রব্য

মন্ত্রী বলেন, সরকার মানসম্মত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাট বীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের আওতায় 'উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাট বীজ উৎপাদন সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৮ থেকে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৬টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাট চাষের উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে চাষিদের প্রশিক্ষিত করা এবং সার্বিকভাবে মানসম্মত পাট ও পাট বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের ৩৯০ মেট্রিক টন পাট বীজ বিনামূল্যে বিতরণসহ সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্প খাতকে আরো শক্তিশালী, নিরাপদ ও প্রতিযোগিতা সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য সরকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। বস্ত্র খাতের 'পোশাক কর্তৃপক্ষ' হিসেবে বস্ত্র অধিদপ্তর তথা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য নতুন নির্দেশনা জারি

সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি পাঠানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে শিক্ষকরা খোঁজ নেবেন এবং পাশাপাশি বাংলাদেশ টেলিভিশনে পাঠদানের আলোকে

মায়ের তত্ত্বাবধানে ঘরে বসে স্কুলের পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ওপর প্রশ্নপত্র দিয়ে আসবেন। ছাত্রছাত্রীরা নিজের খাতায় উত্তর লিখে রাখবেন। পরে শিক্ষকরা তা সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন। এরই মধ্যে মোবাইল ফোনে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের পরামর্শ চালুর উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রণালয়। তাছাড়া বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর ৩৩৩৬-এ ফোন করে ভালোমানের শিক্ষকদের কাছ থেকে শ্রেণিপাঠ ও পরামর্শ নিতে পারবে শিক্ষার্থীরা। এতে ৫ মিনিট পর্যন্ত বিনা খরচে কথা বলা যাবে। ৫ই জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সম্মিলিত উদ্যোগে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এশিয়ার ৫০০ সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' তাদের পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী এশিয়ার ৫০০টি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত এবছরের তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থান পেয়েছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। র‍্যাংকিংয়ে এর অবস্থান ৪০১+। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান, গবেষণা, জ্ঞান আদান-প্রদান, ইন্ডাস্ট্রি ইনকাম ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি– এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এ জরিপ চালানো হয়। পাঁচটি সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান সাইটেশনে ১৬.৪, ইন্ডাস্ট্রি ইনকামে ৩৬.৬, ইন্টারন্যাশনাল আউটলুকে ৪০.৮, রিসার্চে ১০.৭ এবং টিচিংয়ে ১৮.৭। প্রতিটি সূচকের আদর্শ মান ১০০।

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের উচ্চতর স্কেল দেওয়ার নির্দেশ

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের উচ্চতর স্কেল দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৭ই জুন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আসবে

বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সার্বিক ব্যবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ২০শে মে 'বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটির' ৭ম সভায় অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দুটি খাত একটি রপ্তানি অপরটি রেমিটেন্স। চলমান পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্রয় আদেশ বাতিল না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। অনেক দেশ ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ক্রয় আদেশ বাতিল করবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ২০শে মে ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনলাইনে বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটির ৭ম সভায় সভাপতিত্ব করেন। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

ঔষধ আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের যাতে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার কোনো সমস্যা না হয়, সেজন্য অনুরোধ জানানো হয়। এ দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো। সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আসবে এবং রপ্তানিও অনেক বাড়বে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, বিজিএমই-এর প্রেসিডেন্ট ড. রুবানা হক, এনবিআর-এর চেয়ারম্যান, পররাষ্ট্র সচিব, শিল্প সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের প্রতিনিধি।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণের সুযোগ এসেছে। বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় অনেক এগিয়ে গেছে। বিশ্বের বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগের নতুন স্থানের সন্ধান করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ১০০টি স্পেশাল ইকোনোমিক জোনে বিশ্বের অনেক দেশ ও প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছে। চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাপান, চীন থেকে তাদের বিনিয়োগ অন্য দেশে স্থানান্তরের কথা বলছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এতে করে বাংলাদেশের জন্য এক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। বাণিজ্য সহজীকরণ এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সুযোগসুবিধা বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। বিনিয়োগকারীগণ ঝামেলা মুক্ত বিনিয়োগের পরিবেশ চায়। বিশ্বের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের তালিকা তৈরি করে তাদের কাছে বাংলাদেশে বিনিয়োগ পলিসি এবং সুযোগসুবিধাগুলো তুলে ধরতে হবে। ডাইরেক্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই)-এর জন্য বাংলাদেশের সামনে সুযোগ এসেছে, এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

করোনাকালে চট্টগ্রাম ইপিজেডে চীনের নতুন বিনিয়োগ

করোনায় বৈশ্বিক এ পরিস্থিতিতে চীন বাংলাদেশের ইপিজেডকে নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ স্থান বলে মনে করছে। চীনা মালিকানাধীন কোম্পানি মেসার্স ইউনিকর্ন লেদার গুডস ফ্যাক্টরি লিমিটেড চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় একটি লেদার ও কৃত্রিম লেদার প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প স্থাপন করতে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিদেশি মালিকানাধীন এ শিল্পকারখানায় ৭৬৪ বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ১.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। ইউনিকর্ন লেদার গুডস ফ্যাক্টরি বার্ষিক ১ মিলিয়ন পিস ব্যাগ, বেল্ট ও ওয়ালেট উৎপাদন করবে।

এ উপলক্ষে ৩রা জুন ঢাকায় বেপজা কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং মেসার্স ইউনিকর্ন লেদার গুডস ফ্যাক্টরি লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) মোহাম্মদ ফারুক আলম এবং মেসার্স ইউনিকর্ন লেদার গুডস ফ্যাক্টরি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাং ইয়ানহুং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রতিবেদন: উষা রানী রায়

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ফোর্বসের তালিকায় বাংলাদেশের দুই তরুণী

বিশ্বখ্যাত সাময়িকী ফোর্বস-এর তালিকায় এবার স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের দুই তরুণী ইশরাত করিম ও রাবা খান। বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাবনাময় এশিয়ার ৩০ বছরের কম বয়সি ৩০ জন তরুণের তালিকা সম্প্রতি প্রকাশ করেছে ফোর্বস। এশিয়া ২০২০ তালিকায় মিডিয়া, বিপণন ও বিজ্ঞাপন বিষয়ে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের ইউটিউবার ও রেডিও উপস্থাপক রাবা খান। এ তালিকায় সামাজিক

রাবা খান *ইশরাত করিম*

উদ্যোক্তা বিভাগে স্থান পেয়েছেন আমাল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ইশরাত করিম। ফোর্বস-এর ৩০ আন্ডার ৩০ তালিকায় একই বছর বাংলাদেশের দুজন মেয়ে এই প্রথমবার স্থান পেলেন। ফোর্বস ১০টি বিষয়ে বা শ্রেণিতে এ তালিকা করেছে।

২৯ বছর বয়সি ইশরাত ২০১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্সে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডোতে পড়তে যান। সেখানে সোশ্যাল বিজনেসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। পাঁচ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেন আমাল ফাউন্ডেশন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বাল্যবিবাহ, পারিবারিক সহিংসতার শিকার মেয়েদের নিয়ে কাজ করেন। নানাভাবে নির্যাতিত নারীদের স্বাবলম্বী করাই তাদের উদ্দেশ্য। আমাল ফাউন্ডেশন চরাঞ্চলের নারীদের জন্য স্কুল, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে। গয়নাসহ তাদের তৈরি নানা ধরনের অনুষঙ্গ 'অ্যাজোয়া' নামে বিদেশেও বাজারজাত করে। আমাল এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৫২ হাজার নারীর সঙ্গে কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই মে ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ প্রদান ও মোবাইল/অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

২০ বছর বয়সি রাবা খান ইউটিউবার হিসেবে বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়। ভিডিও দেখার ওয়েবসাইট ইউটিউবে 'দ্য ঝাকানাকা প্রজেক্ট' নামে নিজস্ব চ্যানেল রয়েছে রাবা খানের। এই চ্যানেলের গ্রাহক সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি। এ চ্যানেলে রাবা খান কমেডি, বিদ্রুপাত্মক ভিডিওর মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা তুলে ধরেন। রাবা খানের ফেসবুক পেজে অনুসারীর সংখ্যা ৫ লাখ ৬৯ হাজারের বেশি। ইনস্টাগ্রামে তার অনুসারীর সংখ্যা ৪ লাখ ৩১ হাজারের বেশি।

রাবা খান এখন রেডিও এবিসি ৮৯.২ এফএম-এ 'বলিটক' ও 'মডার্ন পিরিতি' নামে নিয়মিত দুটি অনুষ্ঠান করছেন। কয়েকটি বিজ্ঞাপনচিত্রেও অংশ নিয়েছেন তিনি। এছাড়া তিনি বান্ধবী নামে একটি উপন্যাসও লিখেছেন। ২০১৮ সালের নভেম্বরে ইউনিসেফ রাবা খানকে ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর টু অ্যাডভোকেট ফর চিলড্রেন হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

দ্বিতীয় দফায় মাদ্রাসায় আরো ৯ কোটি টাকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশের ৬ হাজার ৯৭০টি কওমি মাদ্রাসায় ৮ কোটি ৬৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৮ই মে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম গণমাধ্যমকে বলেন, এই টাকা ইলেকট্রনিক তহবিল স্থানান্তর (ইএফটি) পদ্ধতির মাধ্যমে ১৭ই মে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ঢাকা বিভাগের ২ হাজার ২০২টি মাদ্রাসার জন্য ২ কোটি ৫৫ লাখ ৩০ হাজার, চট্টগ্রাম বিভাগের ১ হাজার ২১১টি মাদ্রাসায় ১ কোটি ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকা এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ৯৩৭টি মাদ্রাসায় ১ কোটি ৩১ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রংপুর বিভাগের ৮৩৯টি মাদ্রাসার জন্য ৯৪ লাখ ২৫ হাজার, রাজশাহী বিভাগের ৬৬২টি মাদ্রাসার জন্য ৭৪ লাখ ৪৫ হাজার, খুলনা বিভাগের ৪৩১টি মাদ্রাসায় ৫৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা, সিলেট বিভাগের ৪৮৬টি মাদ্রাসার জন্য ৪৮ লাখ ৬০ হাজার এবং বরিশাল বিভাগের ২০২টি মাদ্রাসার জন্য ২৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

প্রেস সচিব বলেন, মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা একশ বা এর কম হলে ১০ হাজার, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০১ থেকে ২০০-এর মধ্যে হলে ১৫ হাজার টাকা এবং ২০১-এর অধিক হলে ২০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর আগে প্রথম দফায় ৬ হাজার ৯৫৯টি কওমি মাদ্রাসায় প্রায় ১০ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

আম্পানের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদেরকে প্রণোদনা দেওয়া হবে

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি না হলেও অল্প কিছু কৃষিজ ফসলের ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে ফলের মধ্যে আম, লিচু, কলা, সবজি, তিল এবং অল্প কিছু বোরো ধানের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির চূড়ান্ত হিসাব নিরূপণের কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মোট জমির পরিমাণ ১,৭৬,০০৭ হেক্টর। ইতোমধ্যে হাওরে শতভাগ, উপকূলীয় অঞ্চলের ১৭ জেলায় ৯৬ শতাংশসহ সারা দেশে গড়ে ইতোমধ্যে ৭২ শতাংশ বোরো ধান কর্তন করা হয়েছে। ফলে ক্ষতির পরিমাণ সামান্য যা আমাদের খাদ্য উৎপাদনে তেমন প্রভাব পড়ে না। ২১শে মে হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবন থেকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ফলে কৃষিতে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে অনলাইনে (জুম প্ল্যাটফর্মে) মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ১৬ই মে ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে করোনা পরিস্থিতিতে আম, লিচুসহ মৌসুমি ফল এবং কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে অনলাইনে মতবিনিময় করেন–পিআইডি

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আম্পানের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শাকসবজি ও মসলা চাষিদের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমন মৌসুমে বিনামূল্যে সার, বীজ ও নগদ সহায়তাসহ বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, ফল ও পান চাষিদেরকে মাত্র ৪ শতাংশ সুদে কৃষি ঋণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, সাতক্ষীরা জেলায় প্রায় ৬০-৭০ ভাগ আম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলায় ঝড়ে পড়া আমগুলো ত্রাণ হিসেবে দুস্থ জনগণের মাঝে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতে একদিকে যেমন আম চাষিরা কিছুটা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন তেমনি দুস্থ এবং অসহায় জনগণের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হবে।

ব্রিফিংকালে কৃষিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ও সকলের সহযোগিতায় মহামারি করোনা এবং সুপার সাইক্লোন আম্পানের মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশের খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তা আরো বৃদ্ধি করে ২০৩০ সালের 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' (এসডিজি) অর্জন করার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কৃষিপণ্য কেনাবেচার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'ফুড ফর ন্যাশন'

দেশের খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্যের সঠিক বিপণন, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, চাহিদা মোতাবেক সহজলভ্যতা তৈরি এবং জরুরি অবস্থায় ফুড সাপ্লাইচেইন অব্যাহত রাখতে ২৩শে মে বাংলাদেশের প্রথম উন্মুক্ত কৃষি মার্কেট প্লেস 'ফুড ফর ন্যাশন (foodfornation.gov.bd) উদ্‌বোধন করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, মহামারি করোনার কারণে শাকসবজি, মৌসুমি ফলসহ কৃষিপণ্যের স্বাভাবিক পরিবহণ এবং সঠিক বিপণন ব্যাহত হচ্ছে। কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সময়মতো বিক্রি করতে পারছে না, আবার বিক্রি করে অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছে না। বর্তমানে কৃষিপণ্যের বাজারজাত করা সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় প্রান্তিক কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্য পায় এবং সেই সাথে ভোক্তারা যাতে তাদের চাহিদা মোতাবেক সহজে, স্বল্প সময়ে এবং সঠিক মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্য পেতে পারে সে লক্ষ্যে 'ফুড ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

শহরের সব বিদ্যুৎ লাইন ভূগর্ভে নিবে সরকার

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শহরাঞ্চলের সব বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ভূগর্ভে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার। দেশের ৪টি শহরের ভূগর্ভস্থ লাইন নির্মাণের এক সমীক্ষা চুক্তি সই অনুষ্ঠানে সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। উন্নত দেশে বিদ্যুতের সব বিতরণ লাইনই থাকে ভূগর্ভে। এতে ঝড়-ঝঞ্ঝার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয় না। ইতোমধ্যে ঢাকায় কিছু এলাকায় হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎ লাইন মাটির নিচে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হলে বিতরণ ব্যবস্থার সব লাইনকেই ভূগর্ভে নিয়ে যেতে হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের সব বিদ্যুতের লাইন মাটির নিচে নিয়ে যাওয়া হবে। শুরুতেই সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ঢাকাসহ আশপাশের এলাকার বিদ্যুতের লাইন মাটির নিচে নেওয়া হবে। ওজোপোডিকো এবং নেসকোর অধীন অঞ্চলগুলোর তার মাটির নিচে যাবে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ঢাকা শহরে বিদ্যুতের তারের জন্য সব গাছের ডাল কেটে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এটা করা যাবে না। এতে পরিবেশের ক্ষতি হবে।

প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দেওয়ার পর আমরা কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। শুধু বিদ্যুতের তার নয়, কিছু সাব-স্টেশনও মাটির নিচে নেওয়া হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভূগর্ভস্থ লাইন যতটা সম্ভব কম খুঁড়ে তার মাটির নিচে নিতে হবে।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিপি'র) পক্ষ থেকে জানানো হয় ২৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয় হবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে। এ জন্য এক বছর সময় লাগবে। প্রকল্পের মাধ্যমে চার শহরের আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপনের রুট নির্ধারণ সহজ হবে।

শিল্প কলকারখানার জন্য ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ

বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পে ডিজেল জেনারেটরের বদলে ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখার বিষয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন ভার্জিনিয়া টেক অ্যাডভান্স রিসার্স ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সাইফুর রহমান। তিনি তার গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন, বিদ্যুৎ না থাকলে এখন দেশের গার্মেন্টস কলকারখানাগুলো ডিজেল জেনারেটর ব্যবহার করছে। এতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হচ্ছে ২০ টাকা। তবে এ জন্য ৫০০ কিলোওয়াট লোডের একটি কারখানার জন্য প্রায় তিন লাখ ৫০ হাজার ডলার বা দুই কোটি ৯৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার বা দুই কোটি ৯৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন। এতে দুই ঘণ্টার বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব। অন্যদিকে ডিজেল জেনারেটরের জন্য মাত্র ৪৭ হাজার ডলার বা ৪০ লাখ টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন।

প্রতিবেদনঃ সানজিদা আহমেদ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বন সংরক্ষণে সরকারের কর্মসূচি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন ঢাকার আগারগাঁও-এর বন অধিদফতরে 'বন ও জীববৈচিত্র্য মূল্যবান অতি, হারালে অপূরণীয় ক্ষতি' প্রতিপাদ্য ধারণ করে সম্প্রতি আয়োজিত আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০২০ আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, গাছ থেকে জীবনের জন্য অপরিহার্য অক্সিজেনসহ বিভিন্ন ধরনের সুফল পাওয়ার পরও প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ মিলিয়ন হেক্টর বন ধ্বংস হচ্ছে। ফলে প্রকৃতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সময় এসেছে নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থেই প্রকৃতির গ্রামীণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজসম্পদ বৃদ্ধিতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বলেন, নার্সারি সৃজন, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বৃক্ষরোপণ করে বনজসম্পদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল রক্ষা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দরিদ্র নিরসনে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে সফল সামাজিক বনায়নের আরতকাল উত্তীর্ণ গাছ আহরণ করে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৬৮ হাজার ৫শ' ৬৪ জন দরিদ্র উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৫৬ কোটি ৮২ লাখ ৩৪ হাজার ৫২২ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, দেশে ২ হাজার বর্গকিলোমিটার নতুন জেগে ওঠা উপকূলীয় চরে বন সৃজন করা হয়েছে।

উপকূলীয় বন সৃজনসহ বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী উদ্যোগের কথা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বনমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানে দেশের বৃক্ষ

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ২৪শে মে ২০২০ রাজধানীতে যৌথনদী কমিশনের সভাকক্ষে ঘূর্ণিঝড় আম্পান পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সভায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম সভায় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে ২৪ শতাংশের বেশি উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বলেন, বন সেক্টরের প্রধান লক্ষ্য বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা-এর ভিত্তিতে 'ফরেস্ট ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান' তৈরি। মন্ত্রী জানান বাংলাদেশের বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে ৪৮টি এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

৫ই জুন পালিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'প্রকৃতির জন্য সময়'। এবছরের আয়োজক দেশ হলো কলম্বিয়া। আয়োজক দেশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, প্রায় ১০ লাখ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির পথে। জীববৈচিত্র্য রক্ষার এখন গুরুত্বপূর্ণ সময়। জার্মানির সহযোগে আয়োজন করা হবে মূল অনুষ্ঠান। গোটা বিশ্বের জীববৈচিত্র্যের ১০ শতাংশই রয়েছে কলম্বিয়ায়। অ্যামাজন রেইন ফরেস্টের একটা বড়ো অংশ রয়েছে কলম্বিয়ায়। পৃথিবীর নানা ধরনের পাখি ও আর্কডের বৈচিত্র্যের নিরিখে প্রথম এই দেশ। গাছপালা, প্রজাপতি, স্বচ্ছ জলের মাছ এবং উভচর বৈচিত্র্যের নিরিখে কলম্বিয়ার স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ ৫ই জুন পরিবেশ দিবসের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তারপর থেকেই প্রতিবছর ৫ই জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ১৯৭২ সালে প্রথম জাতিসংঘ স্টকহোমে পরিবেশ সম্মেলনের আয়োজন করে। তাতে প্রায় ১১৯টি দেশ অংশ নিয়েছিল।

এরপর থেকেই ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হতে থাকে। দিবসটি প্রথম পালিত হয় ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। জাতিসংঘ বলছে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ না করায় আমাদের পরিবেশের ভারসাম্যই নষ্ট হতে চলেছিল। কোভিড-১৯ আমাদের সেই শিক্ষা দিচ্ছে উল্লেখ করে জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, আমরা জীববৈচিত্র্য রক্ষা করলে শুধু খাদ্যেরই যোগান পাব তা নয় বরং ওষুধসহ পরিশুদ্ধ পানি এবং বাতাস পাব– যা মানুষের সুস্থতার বড়ো কারণ হয়ে উঠতে পারে।

প্রতিবেদনঃ রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

গণপরিবহণ চলাচলে সিএমপি'র ১৬ দিক নির্দেশনা

করোনা সংক্রমণ রোধে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের গণপরিবহণ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১লা জুন থেকে গণপরিবহণ চলাচল শুরু করেছে। তবে এসব পরিবহণ পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা রয়েছে। চট্টগ্রামে স্বাস্থ্যবিধি মেনে

নগরীতে সীমিত পরিসরে গণপরিবহণ চলাচলের ক্ষেত্রে ১৬টি দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে এসব নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সিএমপি কঠোর হবে বলে জানানো হয়েছে।

নির্দেশনাসমূহ হলো– ১. জীবাণুনাশক দ্বারা প্রত্যেকটি গাড়ি জীবাণুমুক্ত করতে হবে। সম্ভব হলে যাত্রী নামার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুনাশক ছিটাতে হবে, ২. পরিবহণে স্যানিটাইজার রাখা নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, ৩. গাড়ির ড্রাইভার, হেলপার ও যাত্রীদের প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করবে। হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে ফেসশিল্ড ব্যবহার করতে হবে, ৪. ঠাণ্ডা, জ্বর, সর্দি, কাশির লক্ষণ থাকলে কিংবা অসুস্থ কোনো ড্রাইভার বা শ্রমিককে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে হবে, ৫. গাড়ির দরজা অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে, ৬. গাড়ির অভ্যন্তরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এক সিটে একজন বসবে। পাশাপাশি সিটে যেন দুজন প্যাসেঞ্জার না বসে তা নিশ্চিত করতে হবে, ৭. গাড়ি ছাড়ার পূর্বে হ্যান্ডমাইকে বা মুখে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে কন্ডাক্টর সবাইকে ধারণা প্রদান করবেন, ৮. গাড়িতে কখনোই দাঁড়িয়ে কোনো যাত্রী বহন করা যাবে না, ৯. গাড়ির অভ্যন্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে, ১০. গাড়ি বাসস্ট্যান্ড ব্যতীত কোথাও দাঁড়াবে না। হুড়োহুড়ি করে প্যাসেঞ্জার তোলা যাবে না। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে তুলতে হবে, ১১. ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলতে হবে, ১২. গাড়ির ডকুমেন্ট আপ-টু-ডেট থাকতে হবে। লকডাউনের কারণে কেউ দলিলাদি নবায়ন না করতে পারলে নবায়ন করে গাড়ি চালাবে, ১৩. অবৈধ কোনো গাড়ি চলাচল করবে না। গ্রাম সিএনজি, নিলাম সিএনজি, ব্যাটারিচালিত রিকশা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে, ১৪. দিন শেষে প্রত্যেকটি গাড়িকে জীবাণুনাশক দ্বারা যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে, ১৫. কোভিড নিয়ন্ত্রণে গণপরিবহণ বিষয়ক সব সরকারি নির্দেশনা মেনে চলতে হবে, ১৬. সকল ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে।

হাটবাজার এলাকায় হবে কংক্রিটের সড়ক

দেশের সড়ক-মহাসড়ক সংলগ্ন হাটবাজার এলাকাগুলোতে পর্যায়ক্রমে কংক্রিটের সড়ক নির্মাণ করা হবে। টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা এড়াতে কংক্রিটের সড়ক নির্মাণে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজার সংলগ্ন এলাকায় কংক্রিটের সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদফতর এবং স্থায়ী সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) তাদের আওতাধীন এলাকায় কংক্রিটের সড়ক নির্মাণ করছে। প্রাথমিকভাবে বিটুমিনের চেয়ে কংক্রিটের সড়ক নির্মাণ ব্যয় বেশি হলেও আয়ুষ্কাল বেশি হওয়ায় এটিকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। বর্তমানে কুমিল্লা-নোয়াখালী চার লেন সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে অন্তত ৮ কিলোমিটার সড়ক কংক্রিটের নির্মাণ করা হচ্ছে। সড়ক প্রকৌশলীরা জানান, সাধারণত হাটবাজার সংলগ্ন এলাকার সড়কগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেগুলো অন্য এলাকার চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। বিশেষ করে বাজারে ময়লা-আবর্জনা, পানি এবং ফলমূলের উচ্ছিষ্ট নিয়মিত সড়কে ফেলার কারণে সেই সড়ক অল্প সময়েই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বাজার এলাকার সড়কগুলো কংক্রিটের উপকরণ দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

নিয়োগ হচ্ছে তিন হাজার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সারা দেশে তিন হাজার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ অনুমোদনের ফলে স্বাস্থ্য খাতে নতুন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের প্রক্রিয়া আরো এগিয়ে গেল। খুব তাড়াতাড়ি এ নিয়োগ শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ।

তিনি ৫ই জুন সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন। এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসঙ্গে কাজ করে ঠিক করবে কোন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ হবে। প্রধানমন্ত্রী আগেই মৌখিক অনুমোদন দিয়েছিলেন। ৪ঠা জুন চূড়ান্ত অনুমোদন দেন।

এ অনুমোদনের ফলে বিভিন্ন হাসপাতালে ১২০০টি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (১২তম গ্রেড), মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানের ১৬৫০টি (১৬তম গ্রেড) এবং কার্ডিওগ্রাফারের ১৫০টি (১৬তম গ্রেড) পদে নিয়োগ হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ২১শে মে ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কোভিড-১৯ ওষুধ রেমডেসিভির গ্রহণ করেন–পিআইডি

কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পর দেশে বিভিন্ন গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষার পরিমাণ বেড়ে যায়। বর্তমানে দেশের ৫২টি গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু লোকবলের কারণে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এজন্য মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্বাস্থ্য খাত সংশ্লিষ্টরা।

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় সম্প্রতি ছয় হাজার নার্স এবং দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই মে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিন হাজার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের ঘোষণা দেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে প্রথম রেমডেসিভির উৎপাদন

দেশে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর ওষুধ রেমডেসিভির উৎপাদন সম্পন্ন করেছে খ্যাতনামা ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। ৮ই মে থেকেই শুরু হয়েছে সরবরাহ প্রস্তুতি। এসকেএফ-এর উৎপাদিত রেমডেসিভিয়ের বাণিজ্যিক নাম 'রেমিভির'। বাংলাদেশের ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদনের পর দুই মাসে এসকেএফই বিশ্বে প্রথম ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যারা জেনেরিক রেমডেসিভির উৎপাদন করতে সক্ষম হলো।

কোভিড-১৯ রোগের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি কার্যকারিতা দেখিয়েছে রেমডিসিভি। এটি মানুষের শিরায় ইনজেকশন হিসেবে প্রয়োগ করতে হয়। ওষুধটি বর্তমানে খোলা বাজারে দেওয়া হবে না। এটি দেওয়া হবে চিকিৎসার জন্য সরকার অনুমোদিত হাসপাতাল বা ক্লিনিকগুলোকে।

দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ৪ঠা মে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এই চিকিৎসকদের ১২ই মে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে কর্মস্থলে যোগদান করতে বলা হয়েছে। এর আগে পিএসসি ৩৯তম বিসিএসের অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে এই দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের সুপারিশ করে। চিকিৎসকদের পাশাপাশি ৫ হাজার ৫৪ জন নার্স নিয়োগেরও সুপারিশ করেছে পিএসসি।

করোনা পরীক্ষার নমুনা কোথায় দেবেন– ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ৫০টি কেন্দ্রে করোনা শনাক্তকরণের পরীক্ষা হচ্ছে।

ঢাকায় নমুনা দেওয়া যাবে– * অনলাইনে ফরম পূরণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করানো যাবে। * স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও সরাসরি নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ব্র্যাকের নমুনা সংগ্রহের বুথে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত নমুনা নেওয়া যাবে। ব্র্যাকের বুথ রয়েছে– মিরপুর ১৩ নম্বরের সরকারি ইউনানি আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল * মিরপুর ১৩ নম্বরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার * বাউনিয়া এলাকার আনোয়ারা মুসলিম গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ * উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ * উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের উত্তরা হাইস্কুল * মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন ১০ নম্বর কমিউনিটি সেন্টার * উত্তরখান জেনারেল হাসপাতাল * দক্ষিণখানের জামতলার নবজাগরণ ক্লাব * মোহাম্মদপুরের সূচনা কমিউনিটি সেন্টার * মধুবাগের আসাদুজ্জামান খান কামাল কমিউনিটি সেন্টার * নয়াপল্টনের পল্টন কমিউনিটি সেন্টার জাতীয় প্রেসক্লাব * যাত্রাবাড়ি শহিদ ফারুক সড়কের ৫০ নম্বর ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার * দয়াগঞ্জ বস্তির সুইপার কলোনি * বাসাবো কমিউনিটি সেন্টার * ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি * আমলিগোলা পার্ক ও কমিউনিটি সেন্টার * কামরাঙ্গীরচরের মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম চৌধুরী কমিউনিটি সেন্টার * টঙ্গীর শহিদ আহসানউল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসাপাতাল * সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স * নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন * নয়াবাজার মোড়ের হাজি জুম্মন কমিউনিট সেন্টার

ঢাকায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নমুনা পরীক্ষা করা যাবে– বেসরকারি হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষা করালে সাড়ে ৩ হাজার টাকা আর হাসপাতালের প্রতিনিধি বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করলে সাড়ে ৪ হাজার টাকা খরচ পড়বে।

এভারকেয়ার হাসপাতাল * স্কয়ার হাসপাতাল * প্রাভা হেলথ বাংলাদেশ লিমিটেড * ইবনে সিনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল * এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল * ইউনাইটেড হাসপাতাল * আনোয়ার খান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল * বায়োমেড ডায়াগনস্টিকস * ল্যাবএইড হাসপাতাল

ঢাকার বাইরে পরীক্ষা করানো যাবে– চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) * চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ * কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ * নোয়াখালীর আবদুল মালেক উকিল মেডিক্যাল কলেজ * ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ * জামালপুরের শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ * রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ * রংপুর মেডিক্যাল কলেজ * দিনাজপুরের এম আবদুর রহিম মেডিক্যাল কলেজ * সিরাজগঞ্জের এম মনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজ * সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল * খুলনা মেডিক্যাল কলেজ * কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ * বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ * ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ * নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতাল।

এছাড়া জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে সন্দেহভাজন করোনা রোগীদের নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

লঞ্চ চলাচলে যাত্রী সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান

কোনো ধরনের কার্যক্রম না থাকলে কেউ যেন স্থানান্তর না হয়, কাজ না থাকলে ঢাকামুখী হওয়ার দরকার নেই। ৩১শে মে ঢাকা সদরঘাটে অভ্যন্তরীণ নৌযান, লঞ্চ চলাচল ও যাত্রী সুরক্ষায় সার্বিক প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণকালে নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের সকলের করোনা ঝুঁকি রয়েছে। ঢাকা সদরঘাটে 'জীবাণুনাশক টানেল' বসানো হয়েছে। শুধু সদরঘাট নয়, অন্যান্য বন্দরেও এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে লঞ্চে যাত্রী চলাচলে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। এই নির্দেশনা মানতে সচেতনতা বাড়াতে হবে। লঞ্চ মালিক ও শ্রমিকদেরকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। করোনা আমাদের ভয় নয়, সচেতনতার মাধ্যমেই করোনা জয় করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী সেখানে জীবাণুনাশক টানেল উদ্‌বোধন করেন এবং লঞ্চে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। লঞ্চের

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী ৩১শে মে ২০২০ স্বাস্থ্য ও নৌবিধি মেনে অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল ও যাত্রীদের সুরক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন–পিআইডি

ডেকের যাত্রীদের জন্য মার্কিং করা হয়েছে। তিনি যাত্রীদেরকে মার্কিং অনুযায়ী বসার অনুরোধ করেন। লঞ্চেও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, মিডিয়া কর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা করোনা ঝুঁকির মধ্যে আছে। বাংলাদেশে ৬০ দিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। আসলে কোয়ারেন্টিন, লকডাউন, আইসোলেশন শব্দগুলোর সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলাম না।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সাধারণ ছুটি ৬০দিন অতিক্রম করেছি। ৬০ দিনে আল্লাহর রহমতে দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলার কোথাও কোনো অবনতি ঘটেনি। এটা একটা বিরাট সাফল্য। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' মৌসুমি ঘূর্ণিঝড়ও হয়েছে এবং বিভিন্ন রকম কার্যক্রম থাকার পরও ৯৫ ভাগ মানুষ নির্দেশ মেনে চলেছে। তিনি বলেন, গণপরিবহণ সীমিত আকারে খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে সিদ্ধান্তের আলোকে নৌপথে লঞ্চ চলাচল শুরু হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিআইডব্লিউটিএ দু'একদিন আগে লঞ্চ মালিক-শ্রমিকদের সঙ্গে আরেকটি সভা করেছে। সভায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে লঞ্চে যাত্রী চলাচলে শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য মালিক, শ্রমিক ও যাত্রীদের প্রতি উদার আহ্বান জানান।

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে অভ্যন্তরীণ নৌযান/লঞ্চ চলাচলের বিষয়টি নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরামর্শক কমিটি ও জাতীয় কমিটি রয়েছে। তাদের পরামর্শ ও সুপারিশগুলো আমরা বাস্তবায়ন করছি।

ঢাকার সদরঘাটে ছয়টি 'জীবাণুনাশক টানেল' বসানো হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ১৪টি 'জীবাণুনাশক টানেল' বসানো হবে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

অনলাইনে মুক্তি পেল *টেলিভিশন* চলচ্চিত্র

জনপ্রিয় নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরিচালিত *টেলিভিশন* সিনেমাটি মুক্তির ৭ বছর পর আবার অনলাইনে মুক্তি পেয়েছে। ভারতীয় ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম 'হইচই'-এ সিনেমাটি ৫ই জুন মুক্তি পায়। এতে অভিনয় করেন– মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী ও নুসরাত ইমরোজ তিশা।

বাংলাদেশে ২০১৩ সালের ২৫শে জানুয়ারি মুক্তি পায় টেলিভিশন চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রটি নির্মাণাধীন থাকাকালে গুটেনবর্গ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে *টেলিভিশন* চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্যের জন্য পুরস্কার লাভ করে এবং মুক্তির আগেই জিতে নেয় ২০১২ সালের এশিয়ান সিনেমা ফান্ড ফর পোস্ট প্রোডাকশন পুরস্কার। ৮৬তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ড (অস্কার)-এর বিদেশি ভাষার সিনেমা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য চলচ্চিত্রটিকে বাংলাদেশ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

এছাড়া ১৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'এশিয়ান সিলেক্ট' ক্যাটাগরিতে সেরা সিনেমা হিসেবে 'নেটপ্যাক পুরস্কার' পায়। অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০১৩ এশিয়া-প্যাসিফিক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডে (অ্যাপসা) ফার্স্ট জুরি গ্র্যান্ড পুরস্কার অর্জন করে চলচ্চিত্রটি।

১২ শিল্পীর কণ্ঠে এক গান

বিশ্বে করোনাকালীন সময়টাকে অসময় বলে মনে করছে বিশ্ববাসী। এই অসময়েই নতুন প্রত্যাশা নিয়ে সমসাময়িক ১২ জন শিল্পী গেয়েছেন সময়ের গান 'বাঁচি আশায় ভালোবাসায়'। কবির বকুলের

লেখা এ গানের সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন রাজা বশির। যারা গেয়েছেন– রুমানা ইসলাম খান, বাদশা বুলবুল, বাপ্পা মজুমদার, দীনাত জাহান মুন্নী, দিঠী আনোয়ার, হুমায়রা বশির, কোনাল, রাজা বশির, ইউসুফ আহমেদ খান, সাব্বির জামান, সমরজিৎ রায় এবং প্রিয়াঙ্কা। মিউজিক কম্পোজিশনের পর শিল্পীদের মেইল করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় গানের মিউজিক ট্র্যাক। পরে যার যার হোম স্টুডিওতে ভয়েস দেন শিল্পীরা। মূলত খ্যাতিমান সংগীত ব্যক্তিত্ব বশির আহমেদ এবং মীনা বশিরের পুত্র-কন্যা হুমায়রা বশির এবং রাজা বশিরের পরিকল্পনায় তৈরি হয় এ সময়ের গান– 'বাঁচি আশায় ভালোবাসায়'। গানটি এরই মধ্যে মুক্তি পায় ইউটিউব চ্যানেল সারগাম মিউজিক স্টেশনে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী পালিত

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ২৫শে মে সকাল ১১টায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাঁশরী, জাসাস এবং বাংলাদেশ জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম'

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। নিজে নিরাপদ থাকুন, অন্যকে নিরাপদ রাখুন।

পিআইডি

প্রতিবছর রমজানের শেষ দিন সন্ধ্যায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ'– গানটি বাজতে থাকে চারদিকে। টেলিভিশনের পর্দায় বিচিত্র পরিবেশনায় এই গানটি পরিবেশিত হয়। উৎসব সংগীত হিসেবে এ গানটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য একটি গান। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার মনে সমানভাবে দোলা দিয়ে যায় এই অসাধারণ নজরুল সৃষ্টি। এবার রমজান শেষে ঈদের দিনটিতে ছিল কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী।

করোনা ভাইরাসের কারণে বহুদিন ধরেই জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়। এবারের ঈদের দিন এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে, ভিন্ন পরিবেশে কবি নজরুলকে স্মরণ করা হয়। ভার্চুয়াল নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয় জন্মোৎসব। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্মিত 'জাগো অমৃত পিয়াসী' শীর্ষক ৫০ মিনিটের এক বিশেষ অনুষ্ঠান বিটিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে একযোগে সম্প্রচারিত হয়।

জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। নজরুলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন,'কবি নজরুল ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। যেখানেই অন্যায়-অবিচার, সেখানেই কবির কলম হয়ে উঠেছে খাপছাড়া তলোয়ার'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'নজরুল যে অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন তারই প্রতিফলন আমরা পাই, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম ও কর্মে। কবি নজরুল ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। নারীর অধিকারকে সমুন্নত করেছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি ব্রিটিশ অধীনতা থেকে

ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য স্বরাজের পরিবর্তে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন'।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় আসানসোল মহকুমায় চুরুলিয়া গ্রামে। বাবা কাজী ফকির আহমেদ, মা জাহেদা খাতুন। ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসে। কবি ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র ইন্তেকাল করেন। কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। এখানেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মহাসড়কে জিরো টলারেন্স

মহাসড়কে অপরাধ দমনে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে হাইওয়ে পুলিশ। দেশের মাদক পাচারের অন্যতম রুট ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি মহাসড়কে চাঁদাবাজি বন্ধেও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা অঞ্চলের পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম বলেন, 'মাদক পাচারের সবচেয়ে বড়ো রুট হিসেবে মনে করা হয় ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে। তাই মাদক পাচার রোধে এ দুই মহাসড়কে নানান পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চালানো হচ্ছে নিয়মিত অভিযান। এছাড়া মহাসড়কে চাঁদাবাজি রোধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট হাইওয়ে থানা পুলিশকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, করোনা প্রাদুর্ভাবের মধ্যে কক্সবাজার থেকে বিগত যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে ইয়াবা পাচার। কক্সবাজার থেকে প্রতিদিনই বড়ো বড়ো ইয়াবার চালান যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। এ দুই রুট দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবা পাচারের সময় গত দুই মাসে রেকর্ড পরিমাণ ইয়াবাও উদ্ধার হয়েছে। করোনাকালে ইয়াবা পাচার বৃদ্ধি পাওয়ার খবর পেয়ে মাদক পাচার রোধে কঠোর অবস্থানে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে হাইওয়ে থানাগুলোকে। এছাড়া জিপির নামে চাঁদাবাজি ও শ্রমিক সংগঠন এবং মালিক সংগঠনের নামে চাঁদাবাজি বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে গণপরিবহণ চলাচল, পণ্যবাহী যানবাহনগুলোর নির্বিঘ্নে চলাচল এবং চালকদের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ চালকদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে হাইওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে। যাত্রী হয়রানি রোধেও নানান পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের দোহাজারি হাইওয়ে থানার ওসি ইয়াসির আরাফাত বলেন, মহাসড়ক কেন্দ্রিক অপরাধ দমনে কাজ করছে হাইওয়ে পুলিশ। বিশেষ করে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ইয়াবা পাচার রোধ করতে প্রতিদিনই অভিযান চালানো হচ্ছে। মহাসড়কে চাঁদাবাজি হয় এমন স্পটগুলোতে টহল জোরদার করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

চলতি শিক্ষাবর্ষে একটি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাথমিকে প্রতি শিক্ষাবর্ষে তিনটি ও মাধ্যমিকে দুটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এছাড়া স্কুলগুলো একাধিক ক্লাস টেস্ট বা সিটি পরীক্ষা নিয়ে থাকে। করোনার প্রাদুর্ভাবে স্কুল বন্ধ, তাই চলতি শিক্ষাবর্ষে ৬ মাসে একটি পরীক্ষাও নেওয়া সম্ভব হয়নি। কবে নাগাদ স্কুল খুলবে তাও বলা যাচ্ছে না।

শেরপুরে ২৩শে জুন অনলাইনে স্কুল চালু করেন জেলা প্রশাসক

এ অবস্থায় মাত্র একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর। তাও সম্ভব হবে যদি সেপ্টেম্বরে স্কুল খোলা হয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে সংশয় কাটছে না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মে মাসের শুরুতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। করোনা পরিস্থিতিতে সেটা স্থগিত করা হয়েছে। জুলাই-আগস্টে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা হওয়ার কথা। সেটিও নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। মাধ্যমিকে জুন-জুলাইয়ে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেটিও হচ্ছে না। ফলে আগামী ডিসেম্বরে শুধু বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে।

করোনায় পেছাচ্ছে কলেজ ভর্তি ও নতুন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কার্যক্রম

করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে আটকে গেছে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি এবং নতুন পাঠ্যবই মুদ্রণ ও রচনা কার্যক্রম। ৭ই জুন থেকে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে আন্তঃশিক্ষা সমন্বয়ক বোর্ড থেকে প্রস্তাব করা হলেও তা হচ্ছে না। এই কার্যক্রম আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে সরকারি তত্ত্বাবধানে থাকা একাদশ শ্রেণির চারটি বই বিক্রির লক্ষ্যে দরপত্র কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরুই করা হয়নি। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ভর্তি কার্যক্রম ও পাঠ্যবই তৈরির কাজও দেরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

তথ্যসচিবের পিতা মোহাম্মদ ইউনুসের ইন্তেকাল

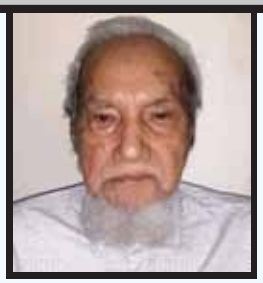

তথ্যসচিব কামরুন নাহারের পিতা ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের শ্বশুর মোহাম্মদ ইউনুস ৪ঠা জুন রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি পাঁচ কন্যা, এক পুত্র ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মরহুম মোহাম্মদ ইউনুসের জানাজা তাঁর জামাতা মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের সরকারি বাসভবন প্রাঙ্গণে স্বল্প পরিসরে সম্পন্ন হয়। পরে রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ও প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তথ্যমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী তাঁদের পৃথক শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তথ্যসচিব কামরুন নাহারের পিতা মোহাম্মদ ইউনুসের মৃত্যুতে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সভাপতি স. ম. গোলাম কিবরিয়া এবং মহাসচিব মুন্সী জালাল উদ্দিন শোক প্রকাশ করেছেন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

কাপ্তাইয়ে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের নগদ অর্থ বিতরণ

কাপ্তাই উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৩ জন অসচ্ছল প্রতিবন্ধীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। ৩১শে মে কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশ্রাফ আহমেদ রাসেল তাদের হাতে নগদ ৫০০ টাকা করে তুলে দেন। করোনাকালীন সময়ে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধী ফান্ড থেকে এই ভাতা প্রদান করা হয়েছে বলে নির্বাহী কর্মকর্তা এ কথা জানান।

কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৩১শে মে নগদ অর্থ বিতরণ করেন

পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার বিতরণ

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়ন পরিষদে করোনা ভাইরাস দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার ১১৫০টি পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল, ১ কেজি আলু, ৫০০ গ্রাম লবণ প্রদান করা হয়েছে। ২২শে মে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অসহায় ১১৫০টি পরিবারের মাঝে এসব ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আলম।

লংগদু উপজেলার নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা পেলেন প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাঙামাটির লংগদু উপজেলার নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা পেলেন প্রধানমন্ত্রীর উপহার আর্থিক অনুদান। ২২শে মে লংগদু উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এলজিইডি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় লংগদু উপজেলার নন-এমপিওভুক্ত ১৯৪ জন শিক্ষকের মাঝে জনপ্রতি ২২ হাজার টাকা করে মোট ৩ লাখ ৮৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। এ আর্থিক সহায়তা শিক্ষকদের মাঝে প্রদান করেন লংগদু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল বারেক সরকার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাঈনুল আবেদীন।

বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় সেনাবাহিনীর খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে লকডাউনে থাকা বান্দরবানের বিভিন্ন পাড়ায় ১১৫ জন পাহাড়ি অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে ২৮শে মে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন সেনা রিজিয়ন-এর কর্মকর্তা মেজর মো. ইফতেখার। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমও অব্যাহত রেখেছে। দুর্গম এলাকায় অসহায় ও দুস্থ পরিবারের সদস্যদের মাঝে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলেও জানান তিনি।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের সেরা মুহূর্তের খেতাব জিতল বাংলাদেশ

এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া ওয়ান ডে বিশ্বকাপগুলোর মধ্যে সেরা মুহূর্ত কোনটি? সত্যি বলতে এমনটি বেছে নেওয়াটা কঠিন। তাইতো আইসিসি সেরা মুহূর্ত বাছাই করতে ভোটের ব্যবস্থা করেছে। আর সেই ভোটের ফাইনালেই শেষ পর্যন্ত সেরা হয়েছে বাংলাদেশের ২০১৫ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড বধের মুহূর্তটি।

এই ভোটিং পোলটি মূলত ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অনুষ্ঠিত ২০১৯ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পেজ থেকে করা হয়েছে। আর ফাইনালের মঞ্চে ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে শিরোপা জিতে বাংলাদেশ, যেখানে ভারত পেয়েছে ৪৯ শতাংশ ভোট। ২রা জুন আইসিসি এই ভোটের ফলাফল প্রকাশ করে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে ২০১৫ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বে শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিল। মাশরাফি বিন মর্তুজার নেতৃত্বে ম্যাচটিতে ১৫ রানের বিস্ময়কর জয় পায় টাইগাররা। আর এই জয়ের মুহূর্তটিই শেষ পর্যন্ত সেরা হলো।

বিশ্বকাপের সেরা মুহূর্তের খেতাব জিতল বাংলাদেশ

জাতিসংঘের শুভেচ্ছাদূত হলেন তামিম

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির জাতীয় শুভেচ্ছাদূত

হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা। ১লা জুন নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির জাতীয় শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় তামিম নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তামিম জানান, আমি জাতিসংঘের সংস্থা ডব্লিউএফপি'র জাতীয় গুডউইল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। এই সংস্থাটি বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করার জন্য কাজ করে চলেছে।

শুভেচ্ছাদূত তামিম বাংলাদেশের ডব্লিউএফপি প্রোগ্রাম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ৬৪ জেলাব্যাপী কাজ করবেন। যেখানে তিনি বিদ্যালয়ে খাবার ব্যবস্থা, পুষ্টি, জীবিকানির্বাহ ও কক্সবাজারে শরণার্থী কার্যক্রমগুলো দেখবেন।

ইএসপিএন ক্রিকইনফোর স্বপ্নের ওয়ান ডে একাদশে সাকিব

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় তিন মাস ধরে স্থগিত আছে সব ধরনের ক্রিকেট আসর। লকডাউনের সময়টাতে সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটাররা সরব হয়ে উঠেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সেখানে ভক্ত-সমর্থকদের অনুরোধে অনেকে নিজেদের স্বপ্নের একাদশও জানিয়েছেন। কিছুদিন আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি পেসার ইয়ান বিশপের সেরা ওয়ান ডে একাদশে জায়গা পেয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের

সেরা অলরাউন্ডার এবার ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র স্বপ্নের ওয়ানডে একাদশেও জায়গা করে নিয়েছেন। সাবেক ও বর্তমান অনেক ক্রিকেটারের বিচার-বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এ স্বপ্নের ওয়ান ডে একাদশ সাজিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইটটি।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

চলে গেলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান

আফরোজা রুমা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান না ফেরার দেশে চলে গেলেন। নভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৪ই মে বিকাল ৪টা ৫৫ মিনিটে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাছাড়া তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগেও ভুগছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

আনিসুজ্জামানের পুরো নাম ছিল আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। জন্ম ১৯৩৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় তাঁর পৈতৃক বাড়ি অবিভক্ত ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাটে। তাঁর বাবার নাম এটি এম মোয়াজ্জেম। তিনি ছিলেন বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক। মা সৈয়দা খাতুন, গৃহিণী হলেও লেখালেখির অভ্যাস ছিল। পিতামহ শেখ আবদুর রহিম ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক। আনিসুজ্জামানরা ছিলেন পাঁচ ভাইবোন। তিন বোনের ছোটো ছিলেন আনিসুজ্জামান, তারপর আরেকটি ভাই। বড়ো বোনও নিয়মিত কবিতা লিখতেন। বলা যায়, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ছিল তাঁদের পরিবার।

কলকাতার পার্ক সার্কাস হাইস্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু করেন আনিসুজ্জামান। ওখানে পড়েছেন তৃতীয় শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত। পরে এদেশে চলে আসার পর অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন খুলনা জেলা স্কুলে। কিন্তু বেশি দিন এখানে পড়া হয়নি। একবছর পরই পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় ভর্তি হন প্রিয়নাথ হাইস্কুলে। আনিসুজ্জামান ছিলেন প্রিয়নাথ স্কুলের শেষ ব্যাচ। কারণ তাঁদের ব্যাচের পরই ওই স্কুলটি সরকারি হয়ে যায় এবং স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নবাবপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল। সেখান থেকে ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক এবং জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫৩ সালে আইএ পাস করা আনিসুজ্জামান কৈশোরেই জড়িয়ে পড়েন রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ভাষার দাবিতে মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রথম যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল, তা লেখার ভার পড়েছিল তাঁর ওপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৫৬ সালে স্নাতক এবং পরের বছর স্নাতকোত্তর শেষ করে মাত্র ২২ বছর বয়সে সেখানেই শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে ১৯৬৫ সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানে তাঁর অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল– 'উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস: ইয়ং বেঙ্গল ও সমকাল'।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে আনিসুজ্জামান চলে যান ভারতে। সেখানে প্রথমে শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে বাংলাদেশেও অস্থায়ী সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগ দেন। ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নানান আন্দোলনে তিনি সব সময় সামনের কাতারে ছিলেন। ১৯৮৫ সালে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরেন আনিসুজ্জামান। সেখানে দেড় যুগ শিক্ষকতা করে ২০০৩ সালে অবসর নেন। দুই বছরের মাথায় আবার তাঁকে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে বাংলা বিভাগে ফিরিয়ে আনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আনিসুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইমেরিটাস অধ্যাপক।

প্রবন্ধ গবেষণায় অবদানের জন্য ১৯৭০ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৮৫ সালে সরকার তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১৫ সালে তিনি পান স্বাধীনতা পুরস্কার। শিক্ষক ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০০৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে সে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'পদ্মভূষণ' পদক দিয়ে সম্মানিত করে। এছাড়া বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন। বাংল সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আনিসুজ্জামান ১৯৯৩ ও ২০১৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদত্ত আনন্দ পুরস্কার, ২০০৫ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি এবং ২০১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন। ২০১৮ সালের ১৯শে জুন বাংলাদেশ সরকার জামিলুর রেজা চৌধুরী ও রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আনিসুজ্জামানকেও জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে ঘোষণা করে। বরেণ্য এই শিক্ষাবিদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এই শিক্ষাবিদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। আমরাও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 12, June 2020, Tk. 25.00

শতবর্ষের বাতিঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী কার্জন হল

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd